বাংলার কবি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
শ্রীব্রজেন্দ্র চৌধুরী

মুদ্রাকর :
শ্রীবিনয়রঞ্জন সিংহ
'ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'
১৪১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

শ্রীমান্ মণীশচন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

ভূমিকা

প্রত্যক্ষতঃ প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র রচনা হইলেও মনে হয় একটি পরোক্ষ সূত্র আছে ইহাদের মধ্যে। প্রবন্ধগুলির সাকুল্যে রবীন্দ্রেতর বাংলাকাব্যের একটি ইতিহাস ও আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার আশা। আরও আশা যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি কেবল বিশিষ্ট কবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে কাব্য ও কবি মাত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা যদি সত্য হয় তবে প্রবন্ধগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখিয়া কাব্যসম্বন্ধে লেখকের ধারাবাহিক ধারণারূপে গ্রহণ করা উচিত। রচনা যদি তাহার প্রসঙ্গকে অতিক্রম করিয়া না যায় তবে তাহা নিতান্তই অক্ষম রচনা।

রচনাগুলিকে সংস্কৃত করিয়া প্রেসের কবল হইতে টানিয়া বাহির করিতে শ্রীমান্ সবিতেন্দ্রনাথ রায় অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেইজন্যে এবং আবার ভবিষ্যতে এমন কষ্ট হয়তো তাঁহাকে আরও স্বীকার করিতে হইতে পারে সেইজন্যও বটে, তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

সূচী

কবি	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
কবি	গোবিন্দচন্দ্র দাস	২৬
কবি	অক্ষয়কুমার বড়াল	৪৫
কবি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৬২
কবি	রজনীকান্ত সেন	৮৬
কবি	প্রিয়ম্বদা দেবী	৯৯
কবি	সতীশচন্দ্র রায়	১১৪
কবি	চতুষ্টয়	১৪০

[যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান,
কুমুদরঞ্জন, কবিশেখর কালিদাস]

বাংলার কবি

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪০—১৯২৬

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা থাকা আবশ্যক। ঐ গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা যথোচিত ফল ফলাইতে পারে না। ঐ গৃহিণীপনা থাকিলে কেবল একটিমাত্র রচনার জোরেও লেখক টিকিয়া থাকে, যেমন ফিট্‌জেরাল্ড ওমর-খৈয়ামের অনুবাদের জোরে টিকিয়া আছেন। আবার ঐ গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া যান। যেমন ওদেশে ল্যান্‌ডর, এদেশে রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্র। আমরা সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অসামান্য। তৎকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পড়িয়া মধুসূদন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।[১] আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন, অযথা প্রশংসা করিবার লোক তিনি ছিলেন না; তিনিও স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।[২]

---

১ "আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; মেঘদূত প'ড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।" —পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়

মধুসূদন যে "দেবেন্দ্র ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কবিত্বে" মুগ্ধ ছিলেন এমন মন্তব্য অন্যত্রও দেখিয়াছি।

২ "আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে স্বপ্নপ্রয়াণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ সব ছাড়া আরো তিনটি রচনা আমার চোখে পড়িয়াছে।[৩] কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, সামান্য কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন প্রজন্মকাল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। মাইকেল ছাড়া আর সকলেই তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণের গুণানুকীর্তন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন—সকলেই একবাক্যে এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস দিয়াছেন।

কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে দেখা যাইতেছে যে উচ্চ আদালতের রায় কাব্যের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও কবির বিশেষ লাভ হয় নাই।[৪] তিনি নামে মাত্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের নামটাও বোধ করি অনেকেরই স্মৃতির অতীত! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গৃহিণীপনার অভাবই কি ইহার কারণ! আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র

রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious! যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে Somehow or other it never came to the surface." —পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়

৩ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি; সতীশচন্দ্র রায়, রচনাবলী; শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২।

৪ স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থাকারে ১৮৭৫ (?) সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭৩ সালে অংশতঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ মাইকেলের মৃত্যুর বৎসর। মাইকেলের চোখে পড়িলে এই অপূর্ব কাব্যের তিনি প্রশংসা করিতেন বলিয়াই আমার ধারণা।

কারণ নয়। আরো কিছু কারণ আছে, আর সে-কারণ কালধর্মে ও পরবর্তী কাব্যধর্মে নিহিত। স্বপ্নপ্রয়াণের মত অমর কাব্যের বিস্মৃতিতে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যেরও পরিচয় নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অনুসন্ধানে নামিলে একাধিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতেছি।

২

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিদিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্রাগ্রজরূপে যে কৌতূহল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই এমনটি হইয়াছে। নতুবা নিজেকে বিদিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা বলা যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল তাঁহার জীবন নয়। এখানে কেবল সেই সকল তথ্যেরই উল্লেখ করিব বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘদূত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজ, বেঙ্গল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারতী, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহর্ষির মৃত্যু হইলে

১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে এই মহানুভব মনীষী লোকান্তরে প্রয়াণ করেন। পঁচাশি বছরের বেশী এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমুষ্টির অধিক নয়। তাই বলিয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রন্থাবলী-আকারে ছাপিলে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্ত রচনা-সমষ্টিকে অতিক্রম করিবে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেজমিনে সে পরীক্ষা না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি।[৫]—

১	মেঘদূত	১৮৬০
২	তত্ত্ববিদ্যা ৪ খণ্ড	১৮৬৬-১৮৬৯
৩	স্বপ্নপ্রয়াণ	১৮৭৫
৪	পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম	১৮৯৮
৫	রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৯১২
৬	গীতাপাঠ	১৯১৫
৭	নানা চিন্তা	১৯২০
৮	প্রবন্ধমালা	১৯২০
৯	কাব্যমালা	১৯২০
১০	চিন্তামণি	১৯২২

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় নয়। কেননা, গদ্য ও পদ্য ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি নিজেকে

৫ পূর্ণতর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", সাহিত্যসাধকচরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ।

নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। জ্যামিতি, স্বরলিপি-উদ্ভাবন, কাগজের বাক্স রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিণীপনা থাকিলে ইহাদের যে-কোন একটি ধারাকে অনুসরণ করিয়া লোকে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কোন পথেরই চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবার চেষ্টা করেন নাই; শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহিণীপনার অভাব। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রতিভার প্রাচুর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন।—

বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

এই উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধর্ম। গদ্য, পদ্য ও বিচিত্রমুখী রচনার কোনটাতেই তাঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নাই। তাঁহার রচনা পড়িতে শুরু করিলে মনে হয় ভাণ্ডারের চরম রত্নগুলি যেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অস্পষ্ট অতৃপ্তি পাঠকের মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠক-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবদন্তী ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি?

এ উদাসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত স্বভাব। তিনি দার্শনিক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার সাংসারিক অনাসক্তির একটি উদাহরণ দিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন—

পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে যথাযথভাবে বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহারবস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন, সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলছেন, 'দীপুকে গিয়ে বলিস আজ যদি আমায় একটি দোয়ানি দেন তবে আমি একখানি খাতা আনাই।' একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি।

যে উদাসীনতা তাঁহাকে একটি দোয়ানি সঞ্চয় করিতে দেয় নাই, সেই উদাসীনতার উত্তর-বাতাসে "স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত।" আবার সেই উদাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এই উদাসীনতা ও রবীন্দ্রনাথ-কথিত গৃহিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার মত। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীস্বভাব নিহিত থাকে, সেটি গৃহিণীপনার ভার লয়। এখন, পুরুষ ষোল আনা পুরুষ হইলে গৃহিণীপনার সুবিধাটুকু হইতে সে বঞ্চিত হয়। তাহার অসুবিধার অন্ত থাকে না। একটি অসুবিধা আত্মপ্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা। সংসারে যেখানে যে-কেহ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম কয়খানি ইঁট তাহাকে স্বহস্তে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে অপরে ইমারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এতটুকু-মাত্র উৎসাহ ছিল না। এ যুগে এ রকম মনোবৃত্তি একান্ত বিরল।

৩

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম কি? তিনি মূলতঃ কবি না দার্শনিক? এ তর্কের মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রথম-যৌবনে তিনি কিছুকাল কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাব্য রচনা করেন নাই, তত্ত্ববিদ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোল্‌রিজের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য তাহা প্রথমজীবনের রচনা, শেষজীবন দর্শন ও সমালোচনাতত্ত্ব লিখিয়া তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। আবার, দুজনেরই কবি-কল্পনা কিঞ্চিৎ উন্মার্গগামী, অলৌকিকের পাড়ায় তাহাদের গতিবিধি। কোল্‌রিজের এনশেণ্ট ম্যারিনার, কুব্‌লা খাঁ ও ক্রীস্টাবেল, দ্বিজেন্দ্র-নাথের স্বপ্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সত্ত্বেও দুজনের প্রতিভার ধর্ম ভিন্ন, কোল্‌রিজ মূলতঃ কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শনিক।

স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্ত্বের টানা-পোড়েনে গ্রথিত; ইহার কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসঞ্জীবন মন্ত্র কল্পনার। স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে—আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তত্ত্ববিদ্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত। এই একটি কারণ যে-জন্য তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তাত্ত্বিক প্রতিভা বলিতে চাই।

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্ত্বে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাষারীতি সর্বত্র গদ্যাত্মক, অর্থাৎ যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যে ভাষা-রীতি বা স্টাইল যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া, শৃঙ্খলা ছত্রভঙ্গ করিয়া উধাও হইয়া যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণে খুঁজিলে মিলিবে না, মিলিবে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির জনক।

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম,
বলিল, যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম,
ভঙ্গ দিতে রণে
পারি বা কেমনে ?
অতএব দেখ মোর সাহসের কর্ম।

কিংবা—

সেই দশা করেছ আমার ; চাই রাখো চাই মারো।
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পারো
নয়ন-ভঙ্গিতে ! বলো বলো তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্মভেদী ঋণ।

আর—

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যা চলিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য ঈশ্বরের মহিমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।

আরও—

কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, 'যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়' কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না, তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ।

এই চারটি অংশ, দুটি গদ্যের দুটি পদ্যের, একই ধর্মবিশিষ্ট, কেবল ছন্দের গুণে একটি পদ্য, ছন্দের অভাবে একটি গদ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের সৃষ্টি যে-মনে, সে-মন গদ্যলেখকের ও তাত্ত্বিকের, যুক্তি শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতার ধাপ ফেলিয়া যে-মন অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত।

এখানে একবার অনুজে অগ্রজে তুলনার লোভ সংবরণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কাব্য তত্ত্বপ্রবন্ধ গল্প যাহাই লিখুন-না কেন সর্বত্র তাঁহার কবিধর্ম ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যেও তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বেও কবি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্যের বুনন যেমন গদ্যাত্মক, রবীন্দ্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত, তাঁহার গদ্য পদ্যাত্মক। সংস্কৃত অলংকার ও ইংরেজী বাক্যের প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটার্নটা একেবারেই দেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইডিয়ম, কিছু সংস্কৃত ভাষ্যের গদ্যরীতি। আবার দুজনের প্রতিভার ধর্মও ভিন্ন, একজন শৃঙ্খলা, যুক্তি ও প্রাঞ্জলতার পথিক, অপরজনে এসব গুণ তেমন লক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি রূপককে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ রূপকের আঙ্গিকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ একই বাড়ির এ-বারান্দা ও-বারান্দার অধিবাসী; এমন ক্ষেত্রে

আশা করা অন্যায় নয় যে, অগ্রজ প্রভূত পরিমাণে অনুজকে প্রভাবিত করিবেন। কিন্তু তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ঐকান্তিক পার্থক্য। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুবাদে বিহাবলাল স্মবণীয় হইয়া বহিয়াছেন, আব অধিকতর শক্তিমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ চিবকালই বিস্মৃতিব ধার ঘেঁষিয়া রহিয়া গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বাপর নাই ; জীবনেব ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে উত্তবপুরুষ পূর্বপুরুষ:ক স্মবণীয় কবিয়া বাখে। উত্তর পুরুষহীন সাহিত্যিক সত্যই ভাগ্যহীন, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই দলেব একজন। অনেকে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে একখণ্ড দ্বীপ বলিয়াছেন। আমি তো বলি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই একখণ্ড দ্বীপ। প্রাচীন ধারার সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিন্ন, আবাব নূতন ধারাব সঙ্গেও যোগ গড়িয়া ওঠে নাই, আবাব তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার ধারেন না। তাঁহার উত্তরপুরুষ নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষই বা কে ? মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র কাহারও সঙ্গে তাঁহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি ? পূর্বাপবহীন তিনি নিঃসঙ্গ একক, দ্বীপখণ্ড বলিলেও যথেষ্ট বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা যুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন গ্রহান্তরের উল্কাখণ্ড, পৃথিবীর জীবনেব মধ্যে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত।

আমার সিদ্ধান্ত এখন দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের

বিরোধ হইয়াছে।...আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি ; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি।...কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোন একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না।...দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism বার আনা বিলাতি চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot আমিও সেই রকম patriot হব, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন ? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল ?

আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আমার মত patriot' না হইবার চেষ্টা করিয়া 'তোমার মত patriot' হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল জিনিস যেমন চলে আসল তেমন চলে না। কালের সহিত আপস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-জাহ্নবী নূতন পথে চলিয়া গেল ; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, শূন্য প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন ; তবে পুরাতন সেই শ্বেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কূলেই নদী বহিত, এখন সব পরিত্যক্ত।

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল ; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত ; কুস্তি জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল ; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি কামার কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম—ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে ; দেশী painting দেখাতে পার ? মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি

বলিলাম, 'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ, এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।

ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসীকে করজোড়ে বসাইয়া ছবি আঁকিতে সেকালের পেট্রিয়টদের বাধিত না, পেট্রিয়ট না হইয়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের সঙ্গে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বেশী মিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। একালের আমরা ব্রিটানিয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া ছবি আঁকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা যে বসিতেন তাহাতে ভুল নাই। ইহাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও 'আমার মত patriot' হওয়া নয়, 'তোমার মত patriot' হওয়ারই রকমফের। শকুন্তলা যদি ভেনাসের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই হইল; ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই হইল—এই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিমত, ইহাকেই তিনি বলিতেন 'তোমার মত patriot' হওয়া। সেদিনের মত ছবিখানা উল্‌টাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবৎকাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে। পরবর্তী কাল কালদ্রোহী দ্বিজেন্দ্রনাথের ছবিখানাই উল্‌টাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই যুগজীবনে তাঁহাকে নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক বিচিত্র কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের স্রষ্টা—দুই-ই নিজ নিজ পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত।

৪

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, আর অল্পই বাকি আছে, সেইটুকু আমি গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রিয়নাথ সেন স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইন ও বানিয়ানের পিল্‌গ্রিম্‌স প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে—সেখানি দান্তের ডিভাইন কমেডি। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তিনখানির কোনটির সঙ্গেই স্বপ্ন প্রয়াণের একাসন নয়। আবার তিনখানির কোনটির দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসত্ত্বেও দুখানির সঙ্গে যদি তুলনা চলে, তৃতীয়খানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের মিল যদি আকস্মিক হয়, তৃতীয়খানির সঙ্গেও তাই। কিন্তু তৃতীয়খানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভার্জিল। তাঁহার পরিচালনায় দান্তে নরক ও Purgatory-র যাবতীয় রহস্য দর্শন করিয়া অবশেষে বিয়াত্রিচের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অনুরূপ। এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্য কোন কবি নয়, স্বয়ং কবিকল্পনা। তাঁহার পরিচালনায় কবি মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল, সমরপুর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে পৌঁছিয়া সপ্তস্বর্গে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন। ডিভাইন কমেডি শান্তিময় প্যারাডাইসে এবং স্বপ্নপ্রয়াণ শান্তিময় শান্তিপুরে

উপসংহৃত। এই দুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবিটি কে? প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন—"একজন কবি বা কবিপ্রকৃতি লোক।" আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর ;
গুণ-জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি।

ইহা স্পষ্টতঃই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।[৬] এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্নপ্রয়াণের নায়কের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয় থাকা উচিত নয়। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আর-একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়—স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনী, রূপক ছলে এই কাব্যে তিনি তাঁহার কবিজীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিতার্থতা বিবৃত করিয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়কত্ব পর্যন্ত ডিভাইন্ কমেডির সঙ্গে মেলে। এ মিল আকস্মিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিক্রমকারী, সে বিচারের

---

৬ সত্য=সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীর=বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণ=গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি=জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোম=সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবনিকেতন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন, কবি—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই কাব্যেব অমিলের কথা তুলিব। স্বপ্নপ্রয়াণ লেখকেব মানসজীবনের ইতিহাস। ডিভাইন কমেডিতে তৎকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি দান্তে মোক্ষকামী মানবমাত্রেবই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, গভীরতায়, কাব্যোৎকর্ষে দুয়ে তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোব অতি প্রকট মিলটা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা কবিয়াছি।

এবার আর-একটি কথা। নানা কারণে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য স্মরণীয়। মেঘনাদবধকাব্যখানিকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক দীর্ঘকাব্য। বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক রূপককাব্য। মধুসূদনী কাব্যবীতি ও রবীন্দ্রকাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের বিচাবেও ইহার স্থান কাব্যরীতি ও ফ্যাশন-পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য নানাভাবে স্মরণীয়। এসব কথা অল্পবিস্তর সবাই জানেন, অনেকেই বলিয়াছেন। আরো একটি কারণে ইহার অনন্যসাধারণত্ব আছে। বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। প্রায় সমসাময়িক সারদামঙ্গল কাব্যেও কবিজীবনের ইতিহাস আছে, কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক; তাছাড়া "মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ সরস্বতীবিরহের" সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবিজীবনকে সঠিকভাবে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কাব্যোৎকর্ষেও দুয়ে ভেদ আছে। সারদামঙ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পষ্ট, স্বপ্নপ্রয়াণ

স্পষ্টতায় ও শৈত্যে শ্বেতপাথরের মূর্তি; সারদামঙ্গল কাব্যের নীহারিকা, স্বপ্নপ্রয়াণ শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ও অচপল। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'তে কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণেব পববর্তী বচনা। কবিজীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যেব মুখ্য বিষযে পরিণত করা দ্বিজেন্দ্রনাথেব একটি প্রধান কৃতিত্ব। আব, নিজের অজ্ঞাতসারে এই কাব্য বচনা কবিয়া বাংলা সাহিত্যেব বোমান্টিক কাব্যরীতিতে তিনি নূতন প্রাণ ও বেগ সঞ্চার কবিয়া দিয়াছেন।

তার পবে যখন মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদর্শিকা করিয়াছেন তখন ওয়ার্ডস্বার্থ-কোলরিজের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বের সমত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ সর্বপ্রথমে কবি ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম বৃত্তিমাত্র ছিল। রোমান্টিক কাব্যেব পুবোধাদ্বয় কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, আর কবিকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারথ্য প্রদান করিলেন। স্বপ্নপ্রযাণ কাব্যে কবি ও কল্পনার সেই নূতন অর্থই আমরা পাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে ইহার আগে মধুসূদন 'মধুকরী কল্পনা'কে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এ 'মধুকরী কল্পনা' রোমান্টিক পুষ্পবনের ভ্রমরী নয়, অষ্টাদশ শতকের কাঁচি-ছাঁটাই সযত্নলালিত উদ্যানের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের 'কবিতাকল্পনালতা'র সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট-এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্যে প্রবেশের

অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'রবি' উদয়ের আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে, স্বপ্নপ্রয়াণে সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য 'প্রভাতসংগীতে'র পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মমুহূর্তের সংগীত'; স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নির্ঝরকে যেন দেখিতে পাই।

৫

রূপক কাব্য যতই প্রাঞ্জল হোক, কাহিনীকাব্যের প্রাঞ্জলতা কখনো পাইতে পারে না। যুগপৎ কাহিনী ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কখনো সে জটিলতা ফেয়ারী কুইন-এর দুর্গমতায় পরিণত হয়, কখনো অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। স্বপ্নপ্রয়াণের গতি সরল, বিন্যাস প্রাঞ্জল আর তাহাতে অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই। তবু রূপক কাব্যে যেটুকু দুরূহত্ব অনিবার্য তাহা অবশ্যই আছে। ইহারই সমাধানমানসে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে দুই-চার ছত্র গদ্য সূচনা যোগ করিয়া দিয়াছেন আমরা সেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাতে সমগ্রের অর্থবোধে সাহায্য হইতে পারে।

প্রথম সর্গ। মনোরাজ্যপ্রয়াণ। সূচনা। স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেকদিন পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গ। নন্দনপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবির বাল্যকালের আনন্দনিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম, সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত, পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়া-মমতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী

(রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার পথে প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী—সুরুচি, মাধবী, শরণ্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্যরসাস্বাদনশক্তি—রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব—মাধুর্যগুণ। শরণ্ময়ী কিনা শারদীয় ভাব—প্রসাদগুণ।

তৃতীয় সর্গ। বিলাসপুরপ্রয়াণ। সূচনা। নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধুলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে কবি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল—এ ঘটনাটিও কবির দুঃখানলে আহুতি দিল।

চতুর্থ সর্গ। বিষাদপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদপুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানাপ্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হুহু গন্ধর্বের নিকট নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

পঞ্চম সর্গ। রসাতলপ্রয়াণ। সূচনা। জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভক্ত অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতলপতি ভয়ানক-রসের নিকটে সঁপিয়া দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে ভৈরব নামক একজন করালমূর্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলি দিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বত্থ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে উদ্ধার করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। সমর-প্রয়াণ। সূচনা। বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সপ্তম সর্গ। শান্তি-প্রয়াণ। সূচনা। রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তিসকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভপরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

৬

কবি-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি না দেখা যাক।

স্বপ্নাবিষ্ট কবি কল্পনার সারথ্যে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন। নন্দনপুরকে aesthetic-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে মানুষ প্রথমে aesthetic জগতে আসিয়া পৌঁছায়। এখানে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলাকৈবল্য বা art for art's sake তত্ত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথভ্রান্তি ও পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা ঘেঁষিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্য পরিণাম তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছে। বিলাসপুরের অধীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদরাজের প্রভাবে "লালসা নাম্নী আদিরসের কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির

দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে” কবি হারাইয়াছেন। এবারে তাঁহার দুঃখের পালা শুরু। কল্পনাকে হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হাস্যরসের নষ্টামির ফলে কবি সোজা বিষাদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। “কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হূহূ গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল।” অবশেষে কবি রসাতলে গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমুহূর্তে তিনি করুণা দেবীর কৃপায় উদ্ধার পাইলেন। পরে সমর-প্রয়াণ। এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া ভয়ানক রসের পরাজয় ঘটিল। এবং বীর কর্তৃক কবি শান্তিপুরে নীত হইলেন। শান্তিপুরের নৃপতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুসঙ্গের কল্যাণে কবির সহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর সে মিলন বিবাহবন্ধনে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে আরো দুটি বিবাহ হইল।

আনন্দভূপ বলিলেন—

হও এস সংসারধরমে ব্রতী
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা ললনা
শোভা, কলপনা,
এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী।

প্রমদার সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত কল্পনার বিবাহ হইয়া গেল—আনন্দনৃপতি তিনে এক কন্যাকর্তা।

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভূতিদ্বয়রূপে এবং প্রমদা (আনন্দ-দানশক্তি) ও শোভাকে (সৌন্দর্য) কল্পনার বিভূতিদ্বয়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাহিনীবিন্যাসের খাতিরে তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া

দেখানো হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন। ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিণী ও আনন্দদায়িনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব।

নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; কিন্তু শান্তিপুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আবাধ্য ধন মাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থই বলিয়াছেন—

পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।…এক কথায় কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতর গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৭]

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌন্দর্যের চেয়ে তাহার তত্ত্বের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারের দিকে তেমন মন দেওয়া হয় নাই,

৭। প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৬৩-৬৪

কেবল প্রিয়নাথ সেনের রচনাটিতে কিছু পরিচয় আছে। দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বপ্নপ্রয়াণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত।

৭

নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদবধ-কাব্যই একমাত্র মহৎ ও দীর্ঘাঙ্গ কাব্য, আপন গঠনসৌকর্যের বলে যাহা দণ্ডায়মান। সর্গের সহিত সর্গ গ্রথিত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা যুক্ত হইয়া অভ্রান্ত লক্ষ্যে ও অমন্থর গতিতে তাহা চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে, সুচালিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যব্যূহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যগুলির আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো তাঁহাদের কিছু কিছু গুণগ্রাহী ব্যক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্তর্নিহিত অনিবার্য কোন নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়—ওসব যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাঁধনটা নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্তুও পাঁচ দোকান ঘুরিয়া সংগৃহীত। স্বপ্নপ্রয়াণের architectonic বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ। মেঘনাদবধ-কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ-কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রষ্ট হইবার বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব—সে নিজেই ছায়াময়, অলক্ষ্যপ্রায় তাহার গতিবিধি, তৎসত্ত্বেও কবি যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। এই

কার্যে সহায় তাঁহার অসামান্য সংযম। যেখানে একটি বিশেষণে চলে সেখানে দুটি তিনি ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দিকে তাঁহার নজর। অযথা শব্দপ্রয়োগ ও ঘটনাবিস্তার তাঁহার দু চক্ষের বিষ। কাব্যের প্রতিটি সর্গ ছন্দ. নৌকার মত হালকা ও তীব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বর্জিত। অথচ যখন মনে পড়ে যে, লৌকিক ও কিম্ভূত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্যকরূপে বুঝিতে পারি পদে পদে কি আত্মসংযম না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এদিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প। অন্য দিকে কল্পনার deification-এ বা দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা রোমান্টিক কাব্যেরও পূর্বসূত্র বটে। শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাংশে রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নপ্রয়াণ যে নূতন কাব্যধারা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র নাথ ইচ্ছা করিলে এই ধারাকে হয়তো সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই যে তিনি শান্তিপ্রয়াণ-অন্তে তত্ত্বপ্রয়াণ করিলেন, নূতন কাব্যপ্রয়াণ আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। কল্পনা যতদিন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, স্বকীয়া হইবার পরে তিনি আর তাহার প্রতি ফিরিয়া তাকান নাই। কি বিড়ম্বনা!

৮

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শিল্পকুশলতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও উদাহরণযোগে নিজেদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দৃষ্টান্ত উদ্ধারের

প্রয়োজন ছিল না, 'এলডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকীর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে-কোন পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সৌন্দর্যসৃষ্টির পরেই লক্ষণীয় তাঁহার সাজসজ্জা ও ভাষা-ব্যবহার-কৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইডিয়ম ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে বিস্মিত করিয়া দেয়। এক-একবার আচমকা মনে হয়, এই বুঝি যথার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।' শ্রীকানাই সামন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেনা যায় না।" চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে ভদ্রেতর বাঙালী যে ভাষা বলিত এখন তাহা বলে না। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মুখ হইতে মাতৃভাষা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছি তাহা হয়তো অধিকতর ঐশ্বর্যময়, কিন্তু অকৃত্রিম বাংলা যে নয় সে কথা সুনিশ্চিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য

বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।

কিন্তু কৃষ্ণকমলের মত বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ভাষান্তর, ভাষা-ভাগীরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দু-চার কথায় সারিবার মত নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম কারণ, ইহার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আয়াস স্বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমাণিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলা-দেশে যে-কয়জন ক্ষুরধার মেধাবিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, logical mind-এর চূড়ান্ত বিকাশ যাহাদের মধ্যে হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। এ হেন ব্যক্তির হাতে স্বপ্ন ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচিত্র কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যই এক বিস্ময়ের বস্তু। মেঘনাদবধ-কাব্যের মতই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্য বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদের অমরত্বের জন্য উত্তরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য মেঘনাদবধ-কাব্যের অকৃতার্থ উত্তর-পুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্থ সৃষ্টি না হইলে মেঘনাদবধ-কাব্যের নিঃসঙ্গ মহিমা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্নপ্রয়াণের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষেরও অভাব—সমস্ত কৃতার্থতা নিজের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিস্ময় আপনাতে আপনি অটল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৮৫৫—১৯১৮

মানুষের মানসজীবনকে বহুগ্রন্থিযুক্ত একটি সুতার সহিত উপমিত করিলে অন্যায় হইবে না। ঐ গ্রন্থিগুলি সংস্কার; কতকগুলি স্বোপাজিত, কতকগুলি সহজাত। ঐসব গ্রন্থির ফলেই সুতাটি দৃঢ় হয়, আবার গ্রন্থির আতিশয্যে সুতায় জট পাকাইয়া যাইতে পারে, সুতাটি অকেজো হইয়া পড়ে। গ্রন্থি না থাকিলেও যেমন চলে না, তেমনি আবার সংখ্যায় বেশি থাকিলেও অচল। ঐ গ্রন্থিগুলি অনেকটা জীবদেহে গ্ল্যাণ্ডের অনুরূপ; জীবদেহ চালাইবার এঞ্জিন স্বরূপ। মানবজীবন গ্ল্যাণ্ডের কর্মতৎপরতার উপরে নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক জীবনের উৎকর্ষ ঐসব সংস্কার বা গ্রন্থির উপরে নির্ভর করে।

সাহিত্য শিল্প দর্শন প্রভৃতি মানসজীবনের ফুল ও ফসল বিশেষভাবে ঐ গ্রন্থির ইতিহাসের সহিত যুক্ত। কিংবা আরও একটু জোর দিয়া বলা যাইতে পারে, মানবদেহের উৎকর্ষ যেমন গ্ল্যাণ্ডগুলির কর্মপটুতার উপরে নির্ভর করে, তাহার মানসজীবনের উৎকর্ষ তেমনি নির্ভর করে ঐ সংস্কারগুলির সার্থকতার উপরে।

মানবসমাজে এমন জাতি দেখা যাইবে না যাহার কোন সাহিত্য বা শিল্প নাই। নিতান্ত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত জাতিরও সংগীত ও শিল্পকলা আছে। আবার সভ্যতার উচ্চধাপে উন্নীত জাতিরও সাহিত্য ও শিল্পকলা আছে। উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক গ্রন্থি বা সংস্কার বর্তমান এবং সেগুলি অল্পাধিক সক্রিয়। কিন্তু

এমন যদি কোন ব্যক্তি থাকে (জাতি সম্ভব নয়), যাহার মানসজীবন গ্রন্থিহীন বা সাধনার ফলে গ্রন্থিবিমুক্ত, তবে সে ব্যক্তি সাহিত্য বা শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করে না। সাধনমার্গের অন্তে উপনীত মহাপুরুষগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যীশু বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সরাসরি সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তাঁহাদের উপদেশাবলীর সরসতা ও বাগ্‌বিভূতি স্মরণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় সাহিত্যসৃষ্টি-ক্ষমতার প্রাচুর্য তাঁহাদের ছিল। ইঁহাদেব প্রত্যেককে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা তাহার অতীত। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, সাধনার দ্বারা মানসিক গ্রন্থিগুলি তাঁহারা খুলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে যন্ত্র সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করে, তাঁহারা সেই যন্ত্রের অতীত হইয়া গিয়াছেন।

নিতান্ত অসভ্য জাতি বা মানবসভ্যতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ আমাদের প্রসঙ্গ নয়। সভ্যসমাজের অন্তর্গত যে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আমাদের আলোচ্য সেই লোক। এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে, সভ্যসমাজের সকল মানুষেরই মানস-জীবনে যদি গ্রন্থি থাকে তবে সকলেই সাহিত্যিক বা শিল্পী হয় না কেন? হয় না কে বলিল? সক্রিয়ভাবে হয় না এই পর্যন্ত। একজন লোক কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারে। ঐ রসগ্রহণ-ক্ষমতাই প্রমাণ করে যে তাহার মানসজীবন গ্রন্থিমুক্ত নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থি সক্রিয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। তাছাড়া, সক্ষম সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি আরও কয়েকটি অবস্থার উপরে নির্ভর করে। শিক্ষা ও পরিবেশ তন্মধ্যে। মূল প্রেরণা যোগায়

ঐ সংস্কার। শিক্ষা ও পরিবেশ আনুষঙ্গিক ; স্রোতের টানের আনুষঙ্গিক যেমন গুণটানা ও পালের হাওয়া, অনেকটা তেমনি আর কি।

সাহিত্য বা শিল্প সম্যক বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির ইতিহাস ও কার্যক্রম বোঝা অপরিহার্য। কোন বিশেষ লেখকের রচনার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে তাহার মানসজীবনের গ্রন্থিগুলির ইতিহাস বোঝা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ববিদ্যা কতক সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ফ্রয়েডীয় বিচারপদ্ধতির শরণ গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না, কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থিগুলির মূল অবচেতন মানসে নিহিত। সেখানে নামিতে না পারিলে পুরা হদিস পাওয়া যাইবে কিরূপে? সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা-পদ্ধতি ক্রমে সেই দিকেই আগাইয়া চলিতেছে মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে এইরূপ একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা আবার অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সন্ন্যাসীর উপস্থিতি আকস্মিক নয়, ঘটনার তাগিদে আরোপিত নয়, লেখকের মনের কোন গ্রন্থি বা সংস্কারের অনিবার্য ফল। আমরা ফলটি মাত্র দেখিতেছি, কিন্তু মূল কোথায়? লেখকের কোন্ অবচেতনার মধ্যে? এসব তত্ত্ব পুরা না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য। শিল্পক্ষেত্রে কেবল শিল্পগত বিচার নিতান্ত একদেশদর্শী। যে রচনা যত রসোত্তীর্ণ, তাহার মূল তত নিম্নগামী। শ্রেষ্ঠ রচনার মূল চেতন মনকে অতিক্রম করিয়া অবচেতন মনে প্রবিষ্ট। অবচেতন মনের ভূগোল

না জানিলে শ্রেষ্ঠ রচনার রহস্য জানা যাইবে কি প্রকারে? বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাস-কম্‌প্লেক্সের (এই গ্রন্থিগুলিই কি কম্‌প্লেক্স?) স্বরূপ না জানা পর্যন্ত বঙ্কিমী উপন্যাসের রূপটুকু মাত্র জানা যাইবে, তাহার বেশি নয়; কিন্তু তাহার বেশিতেই আসল রহস্য।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেই আরও একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের[১] জীবন এইরূপ আর-একটি উদাহরণ। তাঁহার জীবনের একটি কূট গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিশ বৎসর বয়সে কবির প্রথমা স্ত্রী মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে কবির সমস্ত রচনায় একটি তিক্ততা, এক প্রকার জ্বালা, সমস্ত কথায়, বিশেষ নারী-সম্বন্ধীয় কথায়, অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার অভ্যাস দেখা যায়। এমন আগে ছিল না, এই দুর্বিষহ ঘটনার পরে এটি নূতন আমদানি। বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনে যে গ্রন্থি পড়ে তাহার সঙ্গে এই অভ্যাসটি জড়িত। প্রিয়জনের মৃত্যু মাত্রেই দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছিল। সেটি কি? জানা দরকার। তাঁহার চরিতকার বলিতেছেন: "গোবিন্দচন্দ্র পত্নীকে শেষ দেখা দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বাক্যবিনিময় আর হইল না। রাত্রি ৮টার

---

১ ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামে পরিচিত। যথার্থ কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, বাকি সকলে অভাব-কবি: কেহ বা কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে কবি, কেহ বা অন্য কার্যের অভাবে কবি; কাজেই গোবিন্দ দাসকে বিশেষভাবে স্বভাবকবি বলিবার হেতু নাই, খুব সম্ভব বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস হইতে বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে স্বভাবকবি বলা হইয়া থাকে।

সময়ে সারদা সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন (২৬শে নভেম্বর ১৮৮৫)। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। কাহারও মতে "তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত," আবার কেহ কেহ বলেন, "ইহা হইতেই নাকি কবির 'আত্মহত্যা' কবিতাটির সৃষ্টি।"[২] এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, সেই ঘটনাটি কবির পরবর্তী সমস্ত কাব্যকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে কবির স্বর্গতা প্রেয়সী যেমন দিব্যরূপ লাভ করিয়াছে, আর-একদিকে নারীর উপরে অবিচারকারীদের প্রতি সাধারণভাবে কবির ধিক্কার শতগুণ জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে।

বারাঙ্গনা-কুলের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতা আছে, নাম 'প্রতিহিংসা'। বারাঙ্গনার মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—

সেই প্রতিহিংসা বিষ
প্রাণে জ্বলে অহর্নিশ ;
এ তো নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকায়।
এ অধরে রক্তহাসি
নহে এ অমৃতরাশি,
তব রক্ত অভিলাষী জানিও ইহায়।
এ মৃদু মৃণালভুজে
শুধু প্রতিহিংসা বুঝে,
এ বন্ধন নাগপাশে বাঁধিতে তোমায়।[৩]

---

২ গোবিন্দচন্দ্র দাস, পৃঃ ১৮। সাহিত্যসাধকচরিতমালা ৭৪। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ গোবিন্দ-চয়নিকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত।

এই কবিতায় তিক্ততার ও জ্বালার যে আতিশয্য তাহা জীবনের কেবল সাধারণ অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোন বিশেষ গ্রন্থির সহিত যুক্ত। সে গ্রন্থি কবির জীবনে কোথায় পড়িয়াছে? সেই গ্রন্থিপাতের বাস্তব রহস্য কি? কিছু যে আছে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং সেটি স্ত্রীর মৃত্যুরূপ 'শোকাবহ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত' হইলে বিস্মিত হইব না। সেটি জানা দরকার।

কবির জীবনের আর-একটি গ্রন্থি, ভাওয়ালের রাজার আদেশে স্বগ্রাম জয়দেবপুর হইতে কবির নির্বাসন। স্ত্রীর মৃত্যু এবং জয়দেবপুর হইতে নির্বাসন, এই দুটি তিক্ত স্মৃতি কবির পরবর্তী সমস্ত রচনাকে দুঃখে তিক্ততায় জ্বালায় এবং সৌন্দর্যে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য এবং পত্নীর প্রেম —এই দুইটি হইতে অকালে আকস্মিকভাবে শোকাবহভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল সেই ক্ষতমুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে, সেইজন্যই তাঁহার কবিতাবলীতে, তা সে যে-বিষয়েই হোক-না কেন, গলন্ত লাভার ন্যায় একপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তাপ অনুভূত হয়।

ভাওয়াল-জয়দেবপুরে ১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন দুঃখের। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য আশৈশব তাঁহার সহচর। শৈশব হইতেই ভাওয়াল-রাজপরিবারের অনুগ্রহ লাভ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাজপরিবারের কৃপায় ঢাকা নর্মাল স্কুলে এবং

পরে ঢাকায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষা করেন। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের পাঠই তিনি চূড়ান্ত গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে রাজপরিবারে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও শেষ পর্যন্ত তিনি টিকিতে পারিলেন না। কোন ঘটনায় রাজার অবিচার দেখিয়া তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য রাজকর্মচারীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এতদিনে ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য সফল হইল। অতঃপর তাঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে চাকুরি করিতে হয়। কোন চাকুরি দীর্ঘকাল করা তাঁহার হইয়া উঠিত না।

"পনর বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাঁহার পত্নী সারদাসুন্দরীর পিত্রালয়।" কবির ত্রিশ বৎসর বয়সে কবিপত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল সে কথা আগেই বলিয়াছি। "পত্নী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই কবি একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রকে হারাইলেন (১৪ই আগস্ট, ১৮৮৬) ; একে একে আত্মীয় পরিজন সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া গেল। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদার মৃত্যু পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বাকি রহিল কনিষ্ঠা কন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া মণিকুন্তলা।"

নানা কাজে কবিকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতে হইত, এইভাবে কলিকাতার সাহিত্যিক-সমাজে তিনি পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। 'নবযুগ' নামে কোন পত্রিকায় জয়দেব-পুরের রাজপরিবারের সমালোচনাত্মক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। রাজার ধারণা হয়, সেটি গোবিন্দচন্দ্রের রচনা। এই ধারণার বশে, কবির অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, রাজার আদেশে কবি স্বগ্রাম হইতে নির্বাসিত হন। এইবারে তাঁহার দুঃখের পাত্র পূর্ণপ্রায় হইল।

কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এই যে, দুঃখের পাত্র প্রায়শঃ আকারে বড় হইয়া থাকে। কবিজীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ সেই পাত্রকে পূর্ণতর করিতে থাকিয়াছে।

প্রথমা পত্নী সারদার মৃত্যুর সাত বৎসর পরে কবি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এবং পরে যাহার চক্রান্তে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পান। এ দুটিকে সৌভাগ্য বলা চলে। কিন্তু এই সৌভাগ্যোদয়েও কবির মন হইতে পূর্বস্মৃতির কালো ছায়া দূর হইল না। অর্থকষ্টও সমান চলিল।

কবির খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের কোন কোন ভূম্যধিকারী তাঁহাকে কিছু মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। কিন্তু মোটের উপরে তাঁহার অবস্থার বড় তারতম্য ঘটিল না। প্রথমা পত্নীর বিয়োগে এবং জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ায় যে যুগল গ্রন্থি তাঁহার জীবনে পড়িয়াছিল তাহারাই কবিকে পীড়ন করিতে লাগিল। যে-পীড়নের কেন্দ্র মনে, বাহির হইতে তাহার সান্ত্বনা আসিবে কোন্ সূত্রে?

ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। এই সময়ে কলিকাতায় কবিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউটে একটি সভার আয়োজন হয়। বাঙালীর সভার সাধারণ পরিণাম যাহা হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, বক্তৃতা হইল,, চাঁদা উঠিল না; প্রস্তাব গৃহীত হইল, টাকা আসিল না। "বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?" তবু

প্রেতের রাজ্যে এই শুভচেষ্টা আশার সংবাদ। অবশেষে দুর্ভাগ্যে, অভাবে ও রোগে ভুগিতে ভুগিতে কবি ঢাকা শহরে ১৩২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪]

৩

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রতিভার প্রধান লক্ষণ একটা দুর্দমনীয় আবেগ। এই আবেগের প্রচণ্ডতা এমনি যে, কোন বাধা মানে নাই। সাহিত্যিকের সম্মুখে বাধা আসিতে পারে দুইটি : ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক বাধা, আর সামাজিক পরিবেশের বাধা; অর্থাৎ ভাষা-পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ দুটাই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, সব ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে ; কবির প্রতিভায় এবং এই দুই শ্রেণীর বাধায় একটা দ্বন্দ্বের মত চলে ; এবং শেষ পর্যন্ত দুইয়ে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া কবির কাব্যজগৎকে বিধৃত করিয়া রাখে। এই ভারসাম্য কেবল মহাকবিগণের কাব্যেই সম্ভব হয় ; নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহার উদাহরণ মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অল্পশক্তিমান কবিদের বেলাতে এই বাধার ফলে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে। কোন কোন কবি পরিবেশের দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া নতিস্বীকার করেন, আবার কোন কোন কবির ক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে পরিবেশ দুটাই পরাজিত হয়, কবির দুর্দমনীয় প্রতিভা শেষ পর্যন্ত বাগ মানে না। প্রথম প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ভাষা ছন্দ ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে এখানে ভাষা ও ছন্দই প্রাধান্য লাভ

৪ কবির জীবনবৃত্তান্ত সাহিত্যসাধকচরিতমালার পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

করিয়াছে, কবি তাঁহার উত্তরজীবনের কাব্যগ্রন্থসমূহে ভাষা ও ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয় কাজী নজরুল ও গোবিন্দ দাসের কাব্যে। ইঁহাদের দুজনেরই প্রতিভার আবেগ এমন দুর্বার যে, ভাষা ও ছন্দের অর্থাৎ কাব্যের পরিবেশ কিছুতেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই; পাথরের বাঁধকে যেমন পার্বতী নদী কিছুতেই স্বীকার করে না, অনেকটা তেমনি। এ দুটিই ত্রুটি, দুই শ্রেণীর ত্রুটি, প্রভেদের মধ্যে এই। এদিক হইতে, যেমন অন্যদিক হইতেও বটে, বিচার করিলে গোবিন্দ দাসের তুলনা কাজী নজরুল ইসলাম।

নব্যবাংলাসাহিত্যের জন্ম কলিকাতার পরিবেশে। প্রধানতঃ কলিকাতার ভাষা ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করিয়াই নব্য-বাংলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের যে অঞ্চলের লোকই সাহিত্যসৃষ্টি করুন না কেন, কলিকাতার সামাজিক ও ভাষিক পরিবেশরূপ convention বা প্রথাকে স্বীকার করিয়াই সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কালের গতি ইহার অনুকূলে ছিল। কলিকাতা শহর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্যবাংলার জীবনকেন্দ্র, কাজেই কলিকাতার সঙ্গে যোগস্থাপন অধিকাংশ লেখকের পক্ষে কঠিন হয় নাই—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক হইয়াছে। অনেক সময়েই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আগেই লেখকগণ কলিকাতার পরিবেশে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই কলিকাতার পরিবেশ গ্রহণের পক্ষে কোন বাধাই তাঁহারা অনুভব করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ দাসের বেলাতে এমনটি ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের গড়তি অংশটা কলিকাতা হইতে দূরে কাটিয়াছে, তখনই তাঁহার কাব্যের ভিত্তি-পত্তন হইয়াছে। তার পরে পরিণত বয়সে যখন যখন কলিকাতার

সমাজে উপস্থিত হইয়াছেন, নিতান্ত অতিথির মত, অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অতিথির মত উপস্থিত হইয়াছেন; ফলে কলিকাতার সমাজ, যাহা অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে জল-হাওয়ার মত সহজ, তাহাকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; সন্দেহের সঙ্গে, সমালোচনার সঙ্গে, বিরূপ ভাবোদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

নব্যবাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার ভারসাম্য না ঘটায় ভাল মন্দ দুইরূপ ফলই ফলিয়াছে। মন্দর দিক এই যে, কবি যেখানে সমালোচকের কলম হাতে লইয়াছেন সেখানে সবই কেমন একদেশদর্শী হইয়াছে; তাঁহার মতামত যে সব সময় ভুল এমন নয়, কিন্তু ঠিক যেখানে যতটুকু জোর দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়াছেন, নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের সমবেদনার অভাব, আর তার মূলে রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এই জাতীয় বিদ্রূপ-আত্মক সমালোচনা বাস্তবনিষ্ঠার অভাবজাত বলিয়া নিতান্ত লঘু। আর ভালর দিকে সত্যই ভাল; এমন এক প্রকার সরলতা ও আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে সুবর্ণের ওজনেই যাহার মূল্য। শহরের শিক্ষিতসমাজে পল্লীগ্রামের নবাগন্তুক আসিয়া পড়িলে তাহার কথায় ও আচরণে যেমন কৌতূহল সৃষ্টি করে, তাহার গ্রাম্য সরলতা মনকে যেমন আপনি আকর্ষণ করে—গোবিন্দ দাসের অনেক কবিতা শিক্ষিত পাঠকের মনে তেমনি প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে।

'উলঙ্গ রমণী' কবিতাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অকুণ্ঠিতভাবে সত্য কথা বলা বোধ করি শিক্ষিতসমাজে আবাল্যবর্ধিত

---

৫ দ্র° বাঙ্গালি, সৌরভ, আমারি যে দোষ, আমারি কি দোষ, সে কেমন? প্রভৃতি কবিতা। গোবিন্দ-চয়নিকা।

কবির সম্ভব হইত না। বিষয়টি স্বভাবতই কুণ্ঠাজড়িত, একটু হাত কাঁপিলেই সমস্ত কবিতাটি অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে গিয়া পড়িত, কিন্তু সে বিভ্রাট কোথাও ঘটে নাই, তার কারণ বিষয়টির মধ্যে কোথাও কিছু যে কুণ্ঠার কারণ আছে সে বিষয়ে কবি একেবারেই সচেতন নন। তিনি নিঃশঙ্ক অচেতনার সঙ্গে সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কোথাও পা টলে নাই। 'আমার ভালোবাসা' এবং 'নৃসিংহ'—এই জাতীয় আর দুটি কবিতা। এবং এই তিনটি গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতানিচয়ের অন্তর্গত; এ বিষয়ে সার্থক কবিতা লিখিতে এক মহাকবিগণ পারেন, আর পারেন সাহিত্যিক সংস্কারে অনভিজ্ঞ কবিগণ; মধ্যপন্থা এক্ষেত্রে অচল। কিন্তু মহাকবিগণের শিল্পের ইন্দ্রজাল যেখানে আবরণের মত কাজ করিতে পারিত, ইঁহাদের হাতে তাহা সম্পূর্ণ অনাবৃত; কিন্তু যে আবরণ-হীনতায় লজ্জাবোধ নাই, সেখানে লজ্জার কারণও ঘটিতে পারে নাই; ইহা শিশুর নগ্নতা, বন্যের নগ্নতা, সংক্ষেপে এ নগ্নতা দেবতার।

গোবিন্দ দাসের কবিপ্রতিভার এই লক্ষণগুলির সঙ্গে তাঁহার হাস্যরস ও পূর্বোক্ত কূটগ্রন্থিদ্বয় যদি যুক্ত করি তবে তাঁহার প্রতিভার প্রায় সাকুল্যটা পাই, ইহাই তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ।

৪

ময়মনসিংহ জেলার প্রান্তে জাত (কর্মজীবনে দীর্ঘকাল তিনি ময়মনসিংহ জেলাতে কাটাইয়াছেন) এই কবির কাব্য পড়িতে পড়িতে কেন জানি না বারংবার ময়মনসিংহের গাথাকাব্যগুলি মনে পড়িয়া গিয়াছে। সে কি ভাব ও ভাষার সাম্যে? সে কি প্রকাশভঙ্গির অনাড়ম্বর সরলতায়? সে কি প্রকাশ্য বিষয়ের

নির্বিচার আগ্রহে? কিংবা কেবলই একটা ভৌগোলিক সান্নিধ্য-হেতু? ময়মনসিংহ-গাথা কাব্যের কবিদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়রূপে কিছুই জানি না, যেটুকু জানি তার মধ্যে সংশয় ও জ্ঞানের অভাব মিশ্রিত। কিন্তু আমার কেন জানি না এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সেইসব অজ্ঞাতপরিচয় কবিদের জীবন-কাঠামোর মধ্যে এবং গোবিন্দ দাসের জীবনে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সামাজিক আর্থিক এবং আঞ্চলিক একই স্তরের লোক ইঁহারা, কেবল কিছু সময়ের প্রভেদ। কিন্তু সে ভেদও দুস্তর নয় এই জন্য যে, গ্রামাঞ্চলের সময় নগরাঞ্চলের সময়ের চেয়ে মন্দগতি। বিশেষ, উনবিংশ শতকের শেষভাগের জয়দেবপুর ময়মনসিংহ-গাথার কবিদের যুগের গা-ঘেঁষিয়াই বিরাজমান ছিল। এক পরিবেশের ফল একরূপ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। তাই বুঝি এই দুই সময়ের কবিদের মধ্যে এমন ঐক্য, বাহিরের পার্থক্য সত্ত্বেও এমন আন্তরিক ঐক্য। বাস্তবিক স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস ময়মনসিংহ-গাথার স্বভাবকবিদেরই উত্তরপুরুষ। তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বিশিষ্ট অংশ, মহুয়া-মলুয়ার লতাবিতানের শেষ পুষ্পগুচ্ছ। নব্যবাংলা-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অনেকটা আকস্মিক, তাঁহার আন্তরিক যোগ পদ্মাযমুনার পরপারবর্তী ঐসব গাথাকারগণের সঙ্গে।

এটি আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে যখন স্মরণ করি তাঁহার আঞ্চলিক (এখানে গ্রাম ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ) সম্পর্কে প্রীতি; স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণ, শিশুসন্তান যেমন দুর্নিবার অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করে তাহার মাতার প্রতি। তাত্ত্বিকগণ পিতামাতার প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন সে আর এক বস্তু; তাহা তত্ত্ব, তাহা নীতি, তাহা

যেমন সামাজিক সত্য, তেমন আন্তরিক সত্য নয়। শিশুর অন্ধ আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় সেই জন্যই তাহার মূল্য কম। গোবিন্দ দাসের স্বগ্রামের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ শিশুর মাতৃব্যাকুলতার মতই আন্তরিক বস্তু, তাহা patriotism নয়, এমন কি local patriotism-ও নয়। patriotism সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সে-সব সামাজিক সত্য হইতে উদ্ভূত, এমনতর জীবনের বস্তু নয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাছে তাঁহার দামুন্যা ও রত্নানু যেমন সত্য ছিল এবং যে-স্তরের সত্য ছিল, গোবিন্দ দাসের কাছে তাঁহার জয়দেবপুর ও চিলাই নদী তেমনি সত্য এবং তেমনি স্তরের সত্য; যেমন সত্য এবং যেমন স্তরের সত্য কাঁশাই, ধনু, জালিয়াহাওর প্রভৃতি অঞ্চল এসব গাথা-কবিগণের নিকটে। যাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নাই, সে-ই নির্বিশেষকে লইয়া প্যাট্রিয়টিজম্ করে। বিশেষকে মানুষ যখন পায় তখন তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তোলে না। মায়ের মুখের অ্যানাটমি পরীক্ষা করিয়াছে এমন বৈজ্ঞানিকের কথা জানিতে এখনো বাকি আছে।

নব্য বাঙালী কবিগণ এই বিশেষ অর্থে মাতৃভূমির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ঘটনাচক্রের রহস্যময় হস্ত রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কিছুদিনের জন্য নিক্ষেপ করিয়া ছিল। পাবনা রাজসাহী নদীয়া শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর পদ্মা আত্রাই যমুনা—ইহাই সেই বিশিষ্ট অঞ্চল। মূলতঃ ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাছের বাংলা দেশের প্রত্যক্ষ রূপ। এই অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার দিব্যস্ফূর্তি। সে কেবলই কি কাকতালীয়? রবীন্দ্রনাথ জীবনের কমবেশি পনেরটি

বছর প্রায় স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে কাটাইয়া ছিলেন। ইহার আগের ও পরের রবীন্দ্রকাব্যে একপ্রকার নির্বিশেষ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সময়কার কাব্যগুলি বিশেষের রস হইতে সঞ্জাত বলিয়া তাহার মূল্য এমন সমধিক। উঠ্‌তি বয়সে এই আঞ্চলিক পরিবেশটি না পাইলে রবীন্দ্রকাব্য কি রূপ ধারণ করিত কে জানে।

যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে প্রাচীন সমস্ত কাব্যই ভৌগোলিক অঞ্চলবিশেষের ধন, এ সত্য কবিরাও জানিতেন, তাই তাঁহারা 'Leaving great verse to a little clan' কোন দুঃখ অনুভব করিতেন না। গোবিন্দ দাসের কাব্যে সেই প্রাচীন ধারাটির একটি আধুনিক মূর্তি পাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত উল্লেখ নানা কারণে উচিত হইবে না। প্রথম কারণ প্রতিভার অসামান্যতা, দ্বিতীয় কারণ তাঁহার ঐ সময়ের কাব্যে আঞ্চলিক রস ছাড়াও অন্য অনেক রসের মিশাল আছে। তাঁহার ঐ সময়ের কাব্যের ভিত্তিটা আঞ্চলিক হইলেও বস্তুটা বিচিত্র উপাদানে গঠিত। কাজেই নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসই প্রধান এবং খুব সম্ভব উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক রসের কবি। এখানেই তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে যে, কেন স্বগ্রাম হইতে নির্বাসনকে আমরা কবিজীবনের একটি কূটগ্রন্থি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। স্বক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইলে লোকের অসুবিধা হয়, স্বার্থহানি হয়, বড়জোর অভিমানে আঘাত লাগে। কিন্তু গোবিন্দ দাস যে আঘাত পাইয়াছিলেন তাহা এসবের চেয়ে অনেক গুরুতর—একেবারে জৈব অস্তিত্বের মর্মে আঘাত। সে আঘাতের স্মৃতি

তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই, পরবর্তীকালে গ্রামে ফিরিবার অনুমতি পাইলেও ভুলিতে পারেন নাই ; আর শুধু তাই নয়, ঐ বিষময় স্মৃতি তাঁহার জীবনের সাকুল্যটাকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে —'তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি'। এমন আঘাত একমাত্র সে-ই পাইতে পারে যাহার কবিচিত্ত আছে এবং সে কবিচিত্ত মাটিতে বদ্ধমূল। এই মূলে আঘাতের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ দাসের কবিপ্রেরণার একটি মৌলিক বেদনা।

অপর মৌলিক বেদনা তাঁহার পত্নীর শোকাবহ মৃত্যু। এই শোকাবহ ঘটনার স্বরূপ নিশ্চয় জানি না, তবে ইহাতে কবির জীবনে যে কূটগ্রন্থি পড়িয়াছিল সারা জীবনেও আর তিনি তাহা খুলিতে পারেন নাই। বিশ্বের নারীসমাজের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, প্রণয় ও প্রেম, সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ—এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন—ঐ শোকাবহ মৃত্যুর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন, ঐ স্মৃতির দ্বারা সকরুণ। আর শুধু তাই কেন বা বলি, পত্নী জীবিত থাকিলে পতির মনের যে দুর্দম আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি ও শমে ফিরিতে পারিত, নিষ্ফলতাজাত অতৃপ্তি তাহাতে একপ্রকার প্রচণ্ড তীব্রতা ও উত্তাপ দিয়াছে। সে উত্তাপ এমনি উগ্র যে কবির হৃদয় দগ্ধ করিয়া দিয়াছে, দগ্ধহৃদয়-নির্গত সেই লাভাস্রোত পাঠকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াও সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই, তাহার চোখে-মুখে ভাপ লাগে—

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ।
আমি ও-নারীর রূপে
আমি ও-মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ,

ও-কর্দমে অই পঙ্কে
ওই ক্লেদে ও-কলঙ্কে
কালীয়নাগের মত স্ফূর্তি অহরহ—
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস-সহ।[৬]

কিংবা—

যাও নারী, যাও ফিরা,' নতুবা ও বক্ষ চিরা'
চুষে নিব হৃৎপিণ্ড শুষে নিব হাড়,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব
ভীষণ নৃসিংহ রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও, যা আছে তোমার।[৭]

নিছক উত্তাপের বিচারে, তীব্রতার বিচারে, বাংলা সাহিত্যে ইহাদের তুলনা মেলা ভার। ইংরেজ কবি বার্ন্‌স-এর রচনায় ইহাদের দোসর আছে।

কিন্তু এরূপ উত্তাপ মানবহৃদয় দীর্ঘকাল পোষণ করিতে পারে না, দুঃখ যতই তীক্ষ্ণ হোক কালক্রমে তাহার ধার পড়িয়া আসে। কবির দুঃখস্মৃতির ধারও পড়িয়া আসিয়াছে, উত্তাপের পরিবর্তে মাধুর্য, দাহের পরিবর্তে সৌন্দর্য দেখা দিতে শুরু করিয়াছে; মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড ভাস্বরতার স্থানে সন্ধ্যার করুণ লাবণ্য কবি-হৃদয়কে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে—

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়।
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়।[৮]

---

৬ ৭ গোবিন্দ-চয়নিকা

আজো আমি দিন দুপরে
আয়নাতে তার চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়।
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।[৮]

কিন্তু এই শুধু নয়, আরো আছে। কাল যেমন সান্ত্বনা দিতে পারে, তেমনি সান্ত্বনার আর-একটা কেন্দ্র হইতে পারে আপন হৃদয়ের হাস্যরস-বোধ। কবি সে সুখে বঞ্চিত নন। তাঁহার হাস্যরসজাত কাণ্ডজ্ঞানই বলিয়া দিয়াছে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়, শোক সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকা যায়, জীবন একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না—

আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
প্রভাতে সোনার সূর্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে
বুঝিবা আঁধারে রাত চিরকাল রয়।

কিন্তু

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
চোখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
আমিও বাঁচিয়া আছি, আজো মরি নাই।[৯]

এই কবিতাটিতেই কবিজীবনের আর-একটি স্থায়ী সূত্রের আভাস পাওয়া যায়—

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
দীনের আশ্রয় শেষ আছে ভগবান্,
এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে
অনন্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।[১০]

---

৮ ৯ ১০ গোবিন্দ-চয়নিকা

ভগবদ্‌বিশ্বাস কবিজীবনের একটি ঐশ্বর্য, অনেক দুঃখের অনেক সান্ত্বনা তিনি ঐ বিশ্বাস হইতে লাভ করিয়াছেন।

৫

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত ধারণায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, কেননা তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে নব্য-বাংলাসাহিত্যের মূল প্রবাহের বাহিরে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, যেসব কবির সম্বন্ধে লোকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল তাহাতে আঘাত পড়িবার আশঙ্কা। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ অনেক ঊর্ধ্বে, তাঁহাদের প্রথমেই ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিভায় ও প্রতিভার ফলশ্রুতিতে গোবিন্দ দাসের আসন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে উঁচুতে ধার্য হইবে বলিয়াই আমার ধারণা। তবে এ বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য, বস্তুতঃ সাহিত্যসমালোচনা মানেই মতভেদের নূতন দৃষ্টান্ত। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, কাব্যরসিক ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে গোবিন্দ দাস নব্যবাংলাসাহিত্যের একজন major কবি, যেমন major কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম। অনেক প্রখ্যাতনামা কবি বঙ্গবাণীর বীণাযন্ত্রের পুরাতন তন্ত্রীটি বাজাইয়াই যখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন পুরাতনে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গোবিন্দ দাস পুরাতন বীণাযন্ত্রে নূতন তন্ত্রী আরোপ করিয়া নূতনতর সুর ধ্বনিত করিয়াছেন—তার কমে তাঁহার কবি-প্রকৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

১৮৬০—১৯১৯

দুর্ভাগ্য নানা আকারে আসিতে পারে। কিন্তু যে দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের আকারে আসে, তাহার মত বিড়ম্বনা বুঝি আর নাই, কেননা, মানুষ তাহাকে প্রেয়ঃ মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, চরিতার্থতার পথ মনে করিয়া তাহাকে আর ছাড়িতে চায় না। ভাগ্যের এই হের-ফের সংসারের সর্বত্র চলিতেছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? কোন সাহিত্যিকের হাতে যদি গদ্যের কলম থাকে, আর সে যদি কবি বলিয়া প্রশংসিত হয়, তবে সম্ভাবনা এই যে, শক্তির যথার্থ ক্ষেত্র হইতে সে সরিয়া আসিবে। দুর্ভাগ্য এখানে সৌভাগ্যের আকারে আসিল।

কাল্পনিক দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া বাস্তব দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাকাব্য ও লিরিক কাব্যস্রষ্টা বলিয়া হেমচন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহার শক্তির যথার্থ ক্ষেত্র সামাজিক ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায়। ভ্রান্ত প্রশংসায় আলেয়ার দ্বারা চালিত হইয়া কবি শক্তির স্বক্ষেত্রকে ছাড়িয়াছেন, শুধু তা-ই নয়, তিনি শেষ পর্যন্ত চোরাবালিতে পড়িয়াছেন। সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে দুর্ভাগ্যের ক্রিয়া।

নবীন সেনও মহাকাব্যের স্রষ্টা বলিয়া সেকালে কীর্তিত হইয়াছিলেন, একালেও তাহার ঢেউ চলিতেছে। কেহ কদাচিৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির উল্লেখ করিয়া থাকে, সেটি আমার ধারণায় 'আমার জীবন'। নবীন সেনের হাতে সরস স্বচ্ছ গদ্যের কলম ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, সেদিকে কেহ তাঁহার দৃষ্টি

আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছিল ভ্রান্ত পথে। আবার দেখিলাম দুর্ভাগ্য আসিল সৌভাগ্যের ছদ্মবেশে।,

বর্তমান প্রবন্ধের যিনি বিষয় সেই অক্ষয় বড়ালের কাব্য সমালোচনার ইতিহাস হইতেও এমন দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়। তাঁহার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের গুপ্তলীলা বড় বেশি কুফল প্রসব করিয়াছে। একে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি কবিতা, স্বভাবতঃই স্বল্প-পঠিত, তাহাও আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ চার-পাঁচখানি গ্রন্থের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। আবার দুর্ভাগ্যও যেন কোটালের বন্যায় তরঙ্গের পরে তরঙ্গে আসিয়াছে, মাথায় সৌভাগ্যের রজত-কিরীট। এই বিরাট অভিঘাতের ফলে পাঠকের রুচি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি কবির স্বক্ষেত্র হইতে অন্যত্র নীত হইয়াছে; ফলে অক্ষয় বড়ালের কবিতার যে প্রসার ও আদর হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। ভাগ্যের হের-ফেরের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বড়াল-কবির প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গ্রন্থ-সমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

প্রদীপের ভূমিকা লিখিয়াছেন সুরেশ সমাজপতি, কনকাঞ্জলির ভূমিকা লিখিয়াছেন অক্ষয় মৈত্রেয়, শঙ্খের ভূমিকা লিখিয়াছেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এষা কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিপিন পাল।

বলা বাহুল্য, ভূমিকা-লেখকগণ সকলেই বিশিষ্ট লেখক ও মনীষী। কিন্তু সেখানেই তো বিপদ, কারণ স্বপক্ষে নিযুক্ত উকিল যদি বিপক্ষে চলিতে থাকে, তবে মামলা নষ্ট হইতে কতক্ষণ। আর সে উকিল যদি সুদক্ষ হয়, তবে বিপদ বেশি; যত বেশি সুদক্ষ হইবে হইবে বিপদ তত বেশি হইবে। এক্ষেত্রে ঘটিয়াছে ঠিক তাই।

ভূমিকা-লেখকগণ বিপক্ষের যুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন এমন বলি না, তবে তাঁহারা মামলা সুপরিচালনা করেন নাই নিশ্চয়, কারণ কবির স্বক্ষেত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। বিপিন পালের ভূমিকাটি পড়িলে উহা অভিসন্ধিপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। তিনি তাগ্ করিয়াছেন প্যাঁচা, মারিতে চেষ্টা করিয়াছেন বাদুড় ; বড়াল কবির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন তাঁহার তেমন উদ্দেশ্য নয়, যেমন উদ্দেশ্য, গোপন কিন্তু আসল, রবীন্দ্র-কাব্যের নিন্দা, বড়াল-কবি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—তাঁহার ভূমিকার ইহাই যেন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। ইহা প্রমাণের জন্য যুক্তি-কুযুক্তির জাল বুনিতে বুনিতে তিনি এমনই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এষা কাব্যকে টেনিসনের ইন মেমোরিয়াম কাব্যের চেয়ে এবং কুমারসম্ভবের অন্তর্গত রতি-বিলাপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিতে তাঁহার বাধে নাই। এতদিন পরে এ সব উক্তিতে বিচলিত হইবার কিছু থাকিত না, যদি ভূমিকাগুলির প্রভাবে বড়াল-কবির ক্ষতি না হইত।

প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি বিপিন পালের ভূমিকার একটি দোষ, অপর দোষ কবির শক্তির ভুল ক্ষেত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। এই ভুলটি অপর তিনটি ভূমিকারও প্রধান দোষ।

চারজন ভূমিকাকারই বড়াল-কাব্যের তত্ত্ববিচারে নামিয়াছেন। অক্ষয় বড়াল পরলোক মানেন কি না, হিন্দুর নৈরাশ্যবাদ ও খ্রীষ্টানের নৈরাশ্যবাদে কতটুকু প্রভেদ, মৃত্যুর পরে আত্মা কিভাবে বিরাজ করে প্রভৃতি বিষয়ের নিজস্ব মূল্য যাহাই থাক, কাব্যের সৌন্দর্য বিচারে তাহাদের মূল্য এমন কিছু নয়। তত্ত্বের মূল্যে কাব্যের মূল্য নয়। দর্শনশাস্ত্রের মূল্য তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও

যাথার্থ্যের উপরে নির্ভর করে ; কাব্য তত্ত্বনিরপেক্ষ ; তাহা means মাত্র নয়, তাহা end in itself ; কাব্যেই কাব্যের শেষ। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, কবিতার বিষয় অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্ত্বেও তাহার মহৎ কাব্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই, যেমন মেঘনাদ-বধ কাব্য ; আবার কবিতার বিষয়টি অতীব গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও শোচনীয় পরিণামে পৌঁছিতে কাব্যের বাধা নাই, যেমন বৃত্র-সংহার কাব্য। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায় যে, তত্ত্বের মূল্য কাব্য পাইল, ইহা অনেকটা একজনের নম্বর পাইয়া অপরের পাশ করিবার মত।

পূর্বোক্ত চারজন সমালোচক কেবল কবির ক্ষতি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভবিষ্যতের সমালোচকগণের কাজকেও কঠিন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত অবরোধ ভেদ করিয়া বড়াল-কাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ, আবার সে শক্ত প্রাচীর ভাঙাও আয়াসসাধ্য, তা ছাড়া ভাঙিতে পারিলেও সেই ভগ্নস্তূপে পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা।

এই প্রসঙ্গে বাংলা সমালোচনারীতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। রাধিকা বলিয়াছিলেন যে, "তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" ইহা রাধার মুখে মানায় বটে, কারণ রাধা শিল্পী নন, সাধিকা। কিন্তু কাব্য-শিল্প সম্বন্ধে ও কথা একেবারেই প্রযোজ্য নয়। 'তোমার গরবে গরবিনী' বলিলে কবিতার চলে না, কারণ কবিতার সার্থকতা বাহিরে কোথাও নাই, কবিতার মধ্যেই আছে, কবিতা আত্মতন্ত্র, অনন্যনির্ভর এবং অনন্যশরণ। বিজ্ঞান ও দর্শন আর কিছুকে প্রমাণ করে বলিয়া তাহাদের সার্থকতা অন্যত্র, কিন্তু কাব্য কিছু প্রমাণ করে না, নিজেকে প্রকাশ করে মাত্র। সেইজন্য কাব্য-বিষয়ে তত্ত্ব গৌণ এবং অবান্তর।

আলোচ্য বিষয় পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কবির জীবনীর একটা কাঠামো পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা করি। দুয়ে মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যে ও জীবনে কী অচ্ছেদ্য যোগ।

২

১৮৬৩ সনে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষা দিবার পরে স্বাস্থ্যান্বেষণে তিনি দেওঘরে যান। তৎকালে লিখিত শ্মশান-সঙ্গীত নামে কবিতাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত "ত্রিবেণী" গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী স্কলারশিপ পাইয়া তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৭ সনে তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুকে অল্পবিস্তর সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রলালকেও হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা এবং পত্নীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দুইটি স্থায়ী প্রভাব। আর এই দুইটি প্রভাবের ফলেই তাঁহার কাব্যগুলি এক বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। সেকথা পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব।

তৎকালীন হাকিম-সাহিত্যিকগণের জীবন যেমন হইত, দ্বিজেন্দ্র-

লালের জীবনের ছকও প্রায় তেমনি। সামাজিক সম্মান, উপর-ওয়ালার খোঁচা ও শরীরের অকাল-অপটুতা সমস্তই পুরামাত্রায় তিনি পাইয়াছেন। শেষে ব্যাধিজনিত অপটুতার জন্য তিনি ১৯১৩ সনের ২২শে মার্চ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার দশ বৎসর আগে ১৯০৩ সনের ২৯শে নভেম্বর একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সুরবালা দেবী লোকান্তর প্রয়াণ করেন। শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল "ভারতবর্ষ" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার আগেই ১৯১৩ সনের ১৭ই মে সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে দুই মাস বাকী ছিল।

৩

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনকে স্ত্রী-বিয়োগের আগে ও পরে দুই ভাগে সহজেই ভাগ করা যায়। "তারাবাই" ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রী-বিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতে ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটক-গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকা অসম্ভব নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে এই আশায়

তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমন খুবই সম্ভব। যে পত্নী-প্রভাবের আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও সেটি পুনরায় আসিয়া পড়িতেছে। বস্তুত বিষয়টি গুরুতর।

৪

সাহিত্যিক জীবনের সূচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্টিতেই কবির শক্তি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং "আর্যগাথা", "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যের গুণপনা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তাহার কবি-স্বীকৃতি লাভ ত্বরান্বিত হইয়াছিল। শেষের দিকে এই ঘনিষ্ঠতায় ছেদ পড়িয়াছিল। এটি তাঁহার পক্ষে দুর্ভাগ্য।

৫

"আর্যগাথা" (কবিতা ও গান) দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে, তখন কবির বয়স ত্রিশ বৎসর।

"আর্যগাথা"র আলোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বইখানাতে কবিতা ও গান দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। এই প্রসঙ্গে কবিতা ও গানের স্বভাবগত পার্থক্য দেখাইয়া সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কাজেই অধিক বলিবার নাই—রবীন্দ্রনাথের পরে অধিক বলিবার থাকে না। আমরা অন্য প্রসঙ্গ তুলিব।

কবিতা হউক বা গান হউক "আর্যগাথা"র প্রধান আকর্ষণ রচনা-

গুলির অকৃত্রিম গীতি-মাধুর্য। "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র কোন কোন কবিতা বাদে এমন স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-মাধুয আর তাঁহার কাব্যে দেখা যায় না। এমন কি তাঁহার জনপ্রিয় সঙ্গীতগুলিও, অধিকাংশস্থলে জনতার ও রঙ্গমঞ্চের তাগিদে রচিত বলিয়া এই সম্পদ হইতে বঞ্চিত। আগে বলিয়াছি যে, "আর্যগাথা" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার একটি মৌলিক সূত্র। তাহা এই কারণে। প্রেমের মাধুর্য, মহিমা ও সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসে নির্বিচারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও মুখ্যত এই কথাটাই বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এখন, এই গীতি-উচ্ছ্বাস কবি-চিত্তের অকৃত্রিম প্রকাশ হইলেও ইহাতে কবিপ্রতিভার যথার্থ বিশিষ্টতা তেমন প্রকাশ পায় নাই। অধিকাংশ গান-জাতীয় রচনা পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের "ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল" এবং "মায়ার খেলা"র অনেক রচনা মনে পড়িয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি হিসাবে "আর্যগাথা" স্মরণীয় নয়, কাব্যখানা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার অন্য কারণ আছে। যে দুটি মৌলিক সূত্রে তাঁহার বিশিষ্টতম কাব্য রচিত তাহার একটিকে পাইতেছি "আর্যগাথা"য়। সেটি লিরিসিজ্‌ম বা গীতি-উচ্ছ্বাস। অন্য সূত্রটির আলোচনা করিব "আষাঢ়ে" প্রসঙ্গে। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণাদাত্রী যে কবি-পত্নী, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি-পত্নীর প্রভাবের উল্লেখ আগে করিয়াছি। এখন আরও দু'-একটি কথা বলিবার সুযোগ আসিয়াছে। কবি-পত্নীর প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা নূতন বল ও স্ফূর্তি পাইয়াছে। আবার কবিপত্নীর অভাবে তাঁহার প্রতিভা কেমন যেন তির্যক পথ অবলম্বন করিয়াছে। কবিপত্নী জীবিত থাকিলে দ্বিজেন্দ্র-

লালের প্রতিভা পববর্তী পথ ধবিত কিনা সন্দেহ। আর রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে সাহিত্যিক বিবাদে তিনি নামিতেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে।

"আষাঢে" কাব্যেব আলোচনা উপলক্ষ্যে কাব্যখানিব কোন কোন স্থলে ভাষাব ত্রুটি প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যেব স্বাধীনতা বাড়ে না। ববঞ্চ কমিয়া যায়।"

মাঝে মাঝে পদ্যেব গদ্যরূপ-ধাবণ দ্বিজেন্দ্র-কাব্যেব একটি প্রধান দোষ—আব ইহা যে কেবল তাঁহাব "আষাঢে" বা "মন্দ্র"-এব মত ভাষা ও ছন্দেব নূতন পবীক্ষা ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয এমন নয। "আর্যগাথা"র বিশুদ্ধ লিবিক উচ্ছ্বাসেব মধ্যেও গদ্যেব উপলখণ্ড অবিবল।

কিন্তু শাসিত আছে সত্য ও সুন্দরতম ॥
তখন সৌন্দর্যে এসেছিল,
প্রেমে আস নাই ॥
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী
ঝঙ্কার হইত;
হইত আশ্চর্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্ধমধুব সঙ্গীত ও ॥

ছত্রগুলি ভাষাপ্রকৃতি ও ভাবপ্রকৃতিতে বিশুদ্ধ গদ্য।

কাব্যখানিতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রধান সূত্র ও একটি প্রধান দোষের সাক্ষাৎ পাইলাম—একথা মানিয়া লইলেও ববীন্দ্র-প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-বিচাবে "আর্যগাথা"র বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়।

৬

"আষাঢ়ে" (ব্যঙ্গ-কাব্য) প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সনে, তখন কবির বয়স তেত্রিশ বৎসর। এখানা "আর্যগাথা" হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের কাব্য। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে তথা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব এই কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথম প্রকাশ পায়। "আর্যগাথা" রবীন্দ্র-প্রভাবিত, "আষাঢ়ে" অনন্য প্রভাবিত।

ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ির যাত্রা করিতে মেঘনাদ-বধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?"

কাব্যখানাকে এইমাত্র অনন্যপ্রভাবিত বলিয়াছি, কিন্তু খুব সম্ভব কিছু প্রভাব বা প্রেরণা ইহার মূলে আছে। সেটি বায়রনের ডন জুয়ানের প্রভাব। কথাটা রবীন্দ্রনাথেরও মনে পড়িয়াছে। "আষাঢ়ে"র রচনারীতি আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি বলিতেছেন, "বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস লীলাভঙ্গী পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বায়রনের কাব্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন—ইহাও আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ। কিন্তু "আষাঢ়ে"র পরবর্তী "মন্দ্র" কাব্য ডন জুয়ানের প্রভাবের প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ডন জুয়ান কাব্যে নব রসকে একসঙ্গে গুলিয়া বিতরণ করা হইয়াছে, মহৎ ও তুচ্ছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে—

ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য "আষাঢ়ে" কাব্যে নাই—আছে "মন্দ্র" কাব্যের কোন কোন কবিতায়।

আমরা আগে বলিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় সূত্রটির প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। সেটি কী? "আর্যগাথা"য় যেমন বিশুদ্ধ গীতিমাধুর্যের নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ, এখানে তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গরসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ, অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গীতি-মাধুর্য ও ব্যঙ্গ রস দুটিই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক গুণ। মূলে দুইটিই ছিল এবং দুটি দুই উৎস-মুখে নির্গত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণ একই কবিমানসে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের স্ফুরণের ও বিকাশের কি কোন নিয়ম আছে? থাকাই সম্ভব। দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণের কখন কোন্‌টি কী উপলক্ষ্যে স্ফুরিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। জীবনের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আঘাতের ফলে বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিই। ভল্‌তেয়ার যৌবনে একবার রাজরোষে বাস্তিল কারাদুর্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার চরিত্রে একটা বাস্তিল কমপ্লেক্স দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ধর্মান্ধতা ও রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া তিনি সারাজীবন যে সমস্ত রচনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মৌলিক প্রেরণা ঐ বাস্তিলবাসের আঘাত বা বাস্তিল কমপ্লেক্স। উহা হিসাবে গণ্য না করিলে ভলতেয়ারের রচনার

স্বরূপ বিচারে ভুল হইবে। এখন অনেক লেখকের জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে—আর তাহার ফল ফলে তাঁহার সাহিত্য-শাখায়। বিলাতফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহের পরে সমাজ-কর্তৃক একঘরে হইয়াছিলেন। সমাজের এই অন্যায় অনুশাসনটি তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন "একঘরে" নক্শা রচনা করিয়া। ব্যঙ্গরসের আভাস "একঘরে" গ্রন্থে, পূর্ণ বিকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার গীতি-উচ্ছ্বাসের মূলে পত্নীর প্রেম, আবার ব্যঙ্গরসের মূলে বিবাহ সম্পর্কে একঘরে হইবার অভিজ্ঞতা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পত্নী সুরবালা দেবীই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কবির প্রতিভার দুটি স্বতোবিরুদ্ধ সূত্রের মূলে বিরাজমানা। সেইজন্যই প্রবন্ধারম্ভে তাঁহার বিবাহ ও পত্নীকে কবিজীবনে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় উল্লেখ করিয়াছি। কবির বিচিত্র প্রতিভার ও তাহার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস আমি যেমন বুঝি বর্ণনা করিলাম।

৭

"আষাঢ়ে" সম্বন্ধে এতদধিক যাহা বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ সে সমস্ত নিঃশেষে বলিয়াছেন। "আষাঢ়ে" কাব্যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথমবার নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহার চালচলন, ভাব-ভাষা সমস্তই নূতন ও দ্বিজেন্দ্রীয়। ইহার গতিবিধিতে পাল্কির তাল। নিরেট জোয়ান বেহারাগুলি নিছক গদ্য, কিন্তু তাহারা যখন তালে তালে পা মিলাইয়া সুর তুলিয়া চলিতে শুরু করে, তখন একপ্রকার অনির্বচনীয়তা ধ্বনিত হয়—সেইটুকুই পদ্য, সেইটুকুতেই কবিত্ব, সেইটুকুতেই কবির শিল্পের জাদু। ফলত,

ইতিপূর্বে আর কোন কবি গদ্যকে দিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদ্যের পাল্কি বহন করাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যের আলোচনায় এই বাহাদুরি স্মরণ করিয়া বারংবার সপ্রশংস বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

৮

সব দিক বিচার করিলে "মন্দ্র" কাব্যখানাকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ম্যাথু আর্নল্ড যাহাকে "হাই সিরিয়াসনেস" বলিয়াছেন, সেই দৃষ্টি এখানে দেখিতে পাই। "আর্যগাথা"য় জীবনতরঙ্গের সূর্যকরোজ্জ্বল লাবণ্য ও সঙ্গীত; "আষাঢ়ে" কাব্যে অচল অটল তীরভূমিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিভার ব্যঙ্গজ্বালা-অঙ্কিত শুক্তিদাম নিক্ষেপ; কোথাও জীবনসমুদ্রের গহনে প্রবেশের চেষ্টা নাই। সে চেষ্টা প্রথম দেখিলাম এই কাব্যখানিতে। জীবনসমুদ্রের অতলে কবি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা কিংবা রত্নাকরের গর্ভ হইতে কী মণিমুক্তা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে বিচার প্রাসঙ্গিক হইলেও অপরিহার্য নয়। আসল কথা এই যে, "মন্দ্র" কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কেবল আর জীবনাম্বুধির উপরিতলে থাকিয়া সন্তুষ্ট নন, তলাইয়া দেখিবার একটা ঝোঁক তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহাই ম্যাথু আর্নল্ড বর্ণিত "হাই সিরিয়াসনেস"।

কিন্তু এই 'গহন গম্ভীর ভাবটি' সম্বন্ধে পাঠক যে সব সময়ে সচেতন হয় না, তাহার কারণ "মন্দ্র"র বিচিত্র শিল্পকলা দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ শিল্পরীতির সমন্বয়ে গঠিত। "আর্যগাথা"র অকৃত্রিম গীতিমাধুর্য এবং "আষাঢ়ে"র অকৃত্রিম ব্যঙ্গ বিক্ষোভ, এই দুই

বস্তু স্বভাবত ভিন্ন জাতীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতের গুণে ইহারা আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একটি অখণ্ড শিল্পকলায় পরিণত হইয়াছে। যে-পাঠক এই বৈশিষ্ট্য মনে না রাখিয়া "মন্দ্র" অধ্যয়ন করিবে, তাহার ভুল বুঝিবার আশঙ্কা। ঠিক কোন্ শ্রেণীর শিল্প আশা করিতে হইবে ধারণা না থাকিলে অভিনব শিল্পের রসগ্রহণে ভুল না হইয়া যায় না। সাহিত্যে লিরিসিজম্ ও স্যাটায়ার এর সার্থক সংমিশ্রণের মত কঠিন কাজ অল্পই আছে। বায়রনের ডন জুয়ান ও হাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুরূহ শিল্পে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভব একক।

"মন্দ্র"র কতকগুলি বিশিষ্ট কবিতা লইয়া আলোচনা করিলে বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। "হিমালয় দর্শনে", "নবদ্বীপ", "সমুদ্রের প্রতি", "বাইরনের উদ্দেশে", "তাজমহল" প্রভৃতি কবিতা স্বতোবিরুদ্ধের সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলিতে লিরিকে স্যাটায়র-এ অপূর্ব মেশামেশি। এ যেন লিরিকের ক্ষিপ্রগতি অশ্বপৃষ্ঠে স্যাটায়ার-এর বর্শাধারী চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুর লং।

প্রত্যেকটি কবিতাতেই দেখা যাইবে যে, বস্তুর গহনে প্রবেশ করিবার জন্য কবি উৎসুক, কিছুদূর প্রবেশ করিতেও তিনি সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, কতদূর? সে প্রশ্নের উত্তর কবি নিজেই অন্য একটি কবিতায় দিয়াছেন—

'ভূধর দুরধিগম্য, দূর হ'তে অতিরম্য,
ধূম্র নীল তুষারকিরীটি—
নিকটে বিকট শীর্ণ, বন্ধুর কঙ্কর কীর্ণ,
শুষ্ক—যেন উকলের চিঠি।'

রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের প্রতি কবিতায় যদি মানবজীবনের সহিত প্রকৃতির আদিম সম্বন্ধকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, তাজমহল (শাজাহান) কবিতায় যদি মানবাত্মার মহৎ অপূর্ণতার দিব্য আশাবাদ ঘোষণা করিতে সক্ষম হন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল যদি এতদধিক না পারেন, তবে তাহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ গহন গম্ভীরের যে অতলে তলাইয়াছেন, সেখানে অকলঙ্ক মণিমুক্তার ভাণ্ডার, আর দ্বিজেন্দ্রলাল তত নীচে নামিতে পারেন নাই, যেখান হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেখানে মুক্তায় ও বালুতে মেশামেশি। দুজনের প্রবণতা একই, "হাই সিরিয়াসনেস"-এ প্রবেশের প্রবণতা, তবে একজনের ডুব দিবার ক্ষমতা বেশী, একজনের কম—তাহারই দরুন ফলের এই পার্থক্য।

আসল কথা, ডুবিবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, ডুবিবার ক্ষমতা বা একাগ্রতাও আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায় এই একাগ্রতার ন্যূনতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু ও পৃথিবীকে মাতা ও কন্যা কল্পনা করিয়া সমস্ত কবিতাটি একটি সম্বন্ধের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কল্পনা এখানে একাগ্র, সম্বন্ধের ঐক্য ছাড়া দ্বিত্ব কবির চোখে পড়ে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হিমালয় কখনও যোগী, কখনও কুম্ভকর্ণ, কখনও কুঁড়ের বাদশাহ, কখনও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। কোন ধারণার সঙ্গে কোন ধারণার মিল আছে কি? যোগী বৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কুঁড়ের বাদশাহ কেন হইতে যাইবে? আবার কুম্ভকর্ণের পক্ষে যোগী হওয়া বা জরদগব বৃদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমুদ্র সম্বন্ধেও কল্পনার এই অস্থিরচিত্ততা। সমুদ্র একবার পৃথিবীর স্বামী। তারপরে দুরন্ত দস্যু। তারপরে নিতান্তই নৈসর্গিক একটা জলনিধি। অবশেষে "কিংবা তুমি বুঝি

কোন যোগিবর।" উপমার অস্থিরতার মূলে কল্পনার একাগ্রতার অভাব—অর্থাৎ ডুবিবার ক্ষমতার ন্যূনতা। যে গভীরে নামিলে অকলঙ্ক মুক্তা আহৃত হইত, সে গভীরে নামিবার শক্তি না থাকায় হাতে উঠিতেছে বালুমিশ্র মুক্তা। আবার এই একাগ্রতার অভাব হইতেও শিল্প ব্যাপারে ত্রুটি আসিয়া পড়িয়াছে। ধনুকে টঙ্কার বীররসের উদ্দীপনা দেয়, কিন্তু মনুষ্যদেহে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। কবিতাগুলির ভাষায় কোন কোনখানে বিকারের আক্ষেপ লক্ষ্য হয়। ডন জুয়ানের ভাষা কেমন স্বচ্ছ, বিদ্যুদ্‌বৎ, স্বর্গ-মর্ত স্পর্শ করিয়াও কোথাও চেষ্টার লক্ষণ দেখায় না। "মন্দ্র"র কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ চোখে পড়ে, কবি যেন বারে বারে নিজেকে খোঁচা মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন, হয়তো এই ত্রুটির আনুষঙ্গিকরূপে পদ্য, মাঝে মাঝে "আষাঢ়ে"র চেয়ে অধিকতর ক্ষেত্রে, নিছক গদ্যে পরিণত হইয়াছে। কবির কলম যখন গদ্য লিখিয়া ফেলে, তখন বুঝিতে হইবে কলমে আর কেহ লিখিতে শুরু করিয়াছে।

তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ,
তাহার উপর দিয়া,
করিয়া চকিত বিস্মিত জগৎ॥
* * * *
ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব॥
* * * *
বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে মোগল॥
* * * *
আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত করো এ বিশ্ব ভিতর॥
* * * *

কেন পান করিয়াছিলাম
সেই আপাতমধুর বিষ
হইতে আমরণ সেই বিষে জরজর ॥
* * * *
নহে কিছু রাজত্ব ইহার ;
ইহার রাজত্ব নয় গণনায় ; নিত্য ব্যবসার
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার ।

"মন্দ্র"কাব্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির একটি মিশ্র মনোভাব। এই মিশ্র ভাবের চূড়ান্ত ও সুষ্ঠুতম প্রকাশ সুখমৃত্যু কবিতায়। মৃত্যুকালীন আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো
'আয়েসে' মরিতে যেন পাবি ;
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো
কেহ নাহি করে উমেদারি ;"

আর অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—

"রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

এমন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া কবিপত্নী বলিলেন,

"সহজ ভাষায় বলো আসল কথাটি যাহা
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই।"

ধরা পড়িয়া কবি বলিলেন, সত্যই তাঁহার মরিতে ইচ্ছা নাই, কে বা মরিতে চায় ? তবে সত্য কথা বলিলে ক্ষতি কী ? কিছুই ক্ষতি নয়, তবু ঘুরাইয়া বলাই সামাজিক শিষ্টাচার। কেন ইচ্ছা

নাই? জগৎ এমন সুন্দর, জীবন এমন মধুর—এ ছাড়িয়া কে মরিতে চায়?

তদুপরি- মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে!
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে! অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে দেশ হতে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ।

ইহাও না মরিবার একটা কারণ, বোধ হয় আসল কারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের জগৎ খর সূর্যোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-জগৎ। সেখানে সবই স্পষ্ট, সবই প্রত্যক্ষ, সমস্তই নিকট। মধ্যাহ্নে স্পষ্ট বৃক্ষটির সঙ্গে যে একটুখানি অস্পষ্ট ছায়া সংলগ্ন থাকে সেটুকুও বুঝি নাই তাঁহার জগতে। তাঁহার জগৎ স্পষ্ট, তাঁহার কাব্যও স্পষ্ট। এবারে বুঝিতে পারা যাইবে কেন তিনি রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কাব্যকে অস্পষ্ট কাব্য অভিহিত করিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। জীবনের অস্পষ্ট দিকটা কখনও তাঁহার কল্পনায় প্রতিভাসিত হয় নাই, বিষয়টাই তাঁহার ধারণার অতীত।

৯

"মন্দ্র"কাব্য প্রকাশিত হইবার বৎসরাধিক কাল পরে ১৯০৩ সনের নভেম্বর মাসে সুরবালা দেবী লোকান্তর প্রয়াণ করেন। তারপরে বর্তমান প্রবন্ধের অধিকারভুক্ত দুইখানা কাব্য "আলেখ্য" (১৯০৭) ও "ত্রিবেণী" (১৯১২) প্রকাশিত হয়। "ত্রিবেণী" প্রকাশের কয়েক মাস পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটে।

"আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে প্রতিভার কোন নূতন সূত্রপাত ঘটে নাই বা কোন নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই—"মন্দ্রে"র পরিণত কাব্য-রীতিতেই কাব্য দুইটি গঠিত। কাজেই বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল উল্লেখযোগ্য এই যে পত্নী-বিয়োগের আঘাতে কবি একটু স্থিতধী হইয়াছেন, জীবনের গহনে গম্ভীরে আর একটু তলাইয়াছেন। "মন্দ্র"র বিস্ময়চমক হয়তো কাব্য দুটির সর্বত্র নাই, কিন্তু এমন কিছু গুরুভার আছে যাহা "মন্দ্র" কাব্যে বিরল। "মন্দ্র"র পরে তাঁহার শিল্পকলার আর পরিণতি ঘটে নাই সত্য, কিন্তু কবির নিজের কিছু পরিণতি ঘটিয়াছে। সেই পরিণতির ফলটুকু পাই কাব্য দুইটিতে। আরও একটি কথা। "মন্দ্রে"র ভাষায় মাঝে মাঝে যে বিকারের আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছি এখানে তাহা বিরল, চমৎকার সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসও নাই। সমস্তই কেমন স্থির ধীর গম্ভীর। "মন্দ্র" কাব্যে দেখি প্রতিভা-স্ফুরণের নবযৌবন, "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে প্রতিভার প্রৌঢ়ত্ব। "মন্দ্রে"র বসন্ত, "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" বর্ষা।

মনে হ'ল —শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে ;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
তত খারাপ না হতেও পারে।

এ কথা কবির মুখে নূতন বটে, বসন্তের উদ্দামতা প্রগাঢ় বর্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া প্রৌঢ়তায় পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের জন্য একটুখানি আঘাতের প্রয়োজন ছিল। পত্নীবিয়োগ সেই আঘাত। "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাৎসল্যরসের ও দাম্পত্য-রসের কবিতাগুলি কিংবা বলা উচিত যে "মন্দ্র", "আলেখ্য" ও

"ত্রিবেণী"র শুধু নয়, এই দুই রসের কবিতাই দ্বিজেন্দ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এবারে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

১০

বাংলা কাব্যে দাম্পত্যরসের কবিতার অভাব নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমাব বড়াল প্রভৃতির কাব্য প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যও ধরা যাইতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে, দেবেন্দ্র সেন অক্ষয় বড়াল দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এ-কথা সর্বাংশে সত্য নহে। দাম্পত্যজীবনের বাহিরে ও ঊর্ধ্বে প্রেমের যে বিচিত্র ও ব্যাপক মূর্তি আছে, তার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আর এই দুটি রূপের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দাম্পত্যরসের কবিতা এমন জটিল ও বিচিত্র। আর এই দুটি কোটিতে পরিভ্রমণশীল বলিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর কাব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিলকেন্দ্র, কিঞ্চিৎ অস্থির, অনেক সময়ে একটি রসকেন্দ্রে স্থায়িত্ব না পাওয়ায় দণ্ড দুই টলমল করিয়া, হয় এদিকে, নয় ওদিকে গড়াইয়া পড়ে। প্রেমের দাম্পত্য বা প্রাত্যহিক মূর্তি আর প্রেমের রোমান্টিক বা শাশ্বত-মূর্তির মধ্যে কোন একটিকে বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে তিনি পারেন নাই।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,
স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক;
তুমি দাও প্রেম. তুমি দাও
শান্তি স্নেহ এতটুক।
("দাঁড়াও"—"মন্দ্র")

ইহা দাম্পত্যরসের চিত্র—কিন্তু অধিকক্ষণ এ-ভাবটি স্থায়ী হয় নাই। ঐ কাব্যের কুসুমে কণ্টক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

এই প্রেম এই ঈপ্সা
শুধু কাম শুধু লিপ্সা,
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রা'খতে তাঁহার সৃষ্টি ;
আর এই রূপ বৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।

তিনি একবার বলেন—

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজ্জলিতে, স্বর্গীয়
সুন্দর !
("উদ্বোধন"—"মন্দ্র")

কিন্তু মুহূর্ত পরেই—

বুঝিয়াছি এ আমার নির্বাসন ;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মাধ্য আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ করি উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি ; সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষপ্ত রূঢ়,
নিষ্করুণ মর্ত্যভূমে।

ইহাই কেন্দ্রচ্যুতির পরিণাম। এমন কেন হয়, সংক্ষেপে আগে বলিয়াছি প্রেমের দুই মূর্তিকে সমন্বিত করিতে না পারিয়া দুই

কোটির মধ্যে অসহ মাকুর মত তিনি নিরন্তর নিক্ষিপ্ত প্রতিনিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

বলিতে ভাবমার্গের যে সমন্বয় বোঝায় (খুব সার্থক সমন্বয় নয়), সেখানেও তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পরে লিখিত দাম্পত্যরসের অনেক কবিতা "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির প্রকৃতি ভিন্ন। এতদিন কবির মনে একটি অসমন্বয় ছিল—প্রত্যহ ও শাশ্বতের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এবারে তাহা যেন দূর হইয়াছে। এমন হইবার কারণ সহজেই অনুমেয়। মৃত্যু প্রত্যহের যবনিকাখানি অপসারণ করিয়াছে—এখন আর দুটি মূর্তি নাই, আছে একটি, অপগত প্রত্যহের বিরাট আকাশে শাশ্বত। বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যু বাম হাতে পত্নীকে অপহরণ করিয়া দক্ষিণ হাতে তাঁহার নিঃসপত্ন মূর্তি কবির কল্পনালোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। বিরহভাস্বর হইয়া উঠিয়া শূন্য মন্দিরে স্বর্ণসীতা স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। পত্নীবিরহিত রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্য কলমের কর্তব্যপালনমাত্র। পরবর্তী "শিশু" কাব্যেই অন্তরায়িতা সহধর্মিণীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা। পুত্রকন্যার মাতৃবিয়োগের অশ্রুতে পত্নী-স্মৃতি নির্মলতর হইয়া কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। বাৎসল্য-রসের উজানস্রোতে পত্নীপ্রেমের কালিন্দী নূতন সৌন্দর্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরসের মধ্যে একটি পদের মাত্র ব্যবধান।

১১

দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যরসের কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্তর্গত। "আর্যগাথা" হইতে শুরু করিয়া "মন্দ্র" হইয়া "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে আসিয়া পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাগুলিও অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার মতই একই নিয়মে বিবর্তিত হইয়াছে। "আর্যগাথা"য় নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বাৎসল্যরস; "মন্দ্র" কাব্যের বাৎসল্যরস আর নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক নয়—তন্মধ্যে জগতের শুভাশুভ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে জগতের শুভাশুভ তেমন নাই, যেমন ব্যক্তিগত দুঃখের, পত্নীবিয়োগের, পুত্র-কন্যার মাতৃবিয়োগের দুঃখের জ্বালা। "মন্দ্র" কাব্য রচনাকালে তিনি জগতের শুভাশুভের সঙ্গে, নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগসাধনে এমন জড়িত ছিলেন যে, বস্তুর বা ঘটনার নিজস্ব রূপটি প্রায়শ দেখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, আর তাহা কাব্যোৎকর্ষের পক্ষে সব সময়ে যে সুফলপ্রসূ হইয়াছে এমন নয়। তবুও উহা কবির একটি সাময়িক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার বাৎসল্যরসও রঞ্জিত। কাব্য হিসাবে "আর্যগাথা" ও "মন্দ্র"র পরবর্তী কবিতাগুলিই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কবির মননবিচারে "মন্দ্র" কবিতা কটিরও নিজস্ব মূল্য আছে—

"আর্যগাথা"র—

একি রে তোর ছেলেখেলা
বকি তায় কি সাধে—
যা দেখবে বলবে
'ওমা এনে দে ওমা দে।'

'নেবো নেবো' সদাই কি এ ?
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে
হাসতে গিয়ে কাঁদে।

"মন্দ্রে" পরিণত—

কি গো! কে তুমি আবার।
বলি কোথা হতে ?
কি চাও ? কি মনে ক'রে
এ বিশ্ব জগতে ?

এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ, এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা দ্বেষ ভরা নীচ মর্ত্যভূ ম
মাঝখানে, বলি, ওগো, কে আবার তুমি ?

এগুলির সঙ্গে আলেখ্যর ঘুমন্ত শিশু, পুত্রকন্যার বিবাদ, নূতন মাতা, মাতৃহারা, বিপত্নীক প্রভৃতি কবিতা তুলনা করিয়া পড়িলে প্রভেদটা কোথায় ও কী বুঝিতে পারা যাইবে। ইতিমধ্যে কবির জীবনে একটা বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে—পত্নী সুরবালা লোকান্তরিতা। এই ঘটনাটির গুরুত্ব বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি—আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১২

বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, একটি নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। "মন্দ্র" কাব্যে সেই কাব্যরীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ভাষায়, ছন্দে ও স্বতোবিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ-চাতুর্যে ইহার অভিনবত্ব। তিনি পদ্যকে গদ্যের ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে টানিয়া নামাইয়াছেন, পদ্যের এই

ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে নূতন ; সে নূতন অভাবিতবেশে দেখা দিয়া চমক লাগাইয়া দিয়াছে; এ যেন রাজরাণী দ্রৌপদীর রাজদাসী সৈরিন্ধ্রীবেশ ধারণ। আর কোন কারণে না হইলেও (অন্য কারণও আছে) শুধু এই অভিনব কাব্যরীতির জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবেন। কিন্তু তবু যে লোকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলিতে বসিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এ রীতিটি পরবর্তী কাল এখনও গ্রহণ করে নাই। যে পথের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ ও একমাত্র পথিক, চলাচলের অভাবে ঘাস গজাইয়া তাহা ঢাকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ চোখে না পড়িলেও পথটা লোপ পায় নাই, নূতন পদপাতের অপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছে। অনুগামীর মধ্যে পুরোগামী স্থায়িত্ব লাভ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অনুগামী নাই।

১৩

আজকাল অনেক উদ্যোগী প্রকাশক প্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশ বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে বাংলা সাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যখ্যাতি দুইয়েরই উপকার হইবে। আমার ধারণার কথা গোড়াতেই বলিয়াছি : নাট্যকাররূপে নয়, বিশেষ একটি কাব্যরীতির কবিরূপেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাইবার সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত কাব্য-সঙ্কলন সেই সম্ভাবনাকে নিশ্চয়তার কোঠায় আনিয়া দিতে সাহায্য করিবে। আর এই উদ্যোগের ফলে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, এমন আশঙ্কা করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

কবি রজনীকান্ত সেন

১৮৬৫—১৯১০

অদৃষ্টবিধাতা কোন কোন স্বনির্বাচিত পুরুষেব জন্য স্বহস্তে গৌরবের মুকুট প্রস্তুত কবিয়া থাকেন, সে মুকুটের উপাদান বেদনার স্বর্ণ ও অশ্রুর মুকুতা। চর্মচক্ষের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে সেই দুরূহ সৌভাগ্যের ভারে হতভাগ্যের সমস্ত জীবন ও যাবতীয় আশাভবসা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তখন বিধাতা যে কী আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন কে বলিবে। তবে কখনো কখনো বিধাতার মর্মজ্ঞ ব্যক্তির চোখে এ হেন দৃশ্য পড়িলে তিনি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন, তিনি দেখেন যে বিধাতাপুরুষ মানবাত্মার মহত্ত্বেব যাচাই করিয়া লইতেছেন, দেহ ও আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মার জয় দেখিয়া তাঁহাব আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকিভেছে না।

ক্যানসার-রোগাক্রান্ত নিশ্চিতমৃত্যু রজনীকান্তকে দেখিয়া ববীন্দ্র-নাথ যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহা বিধাতার মর্মগ্রাহিতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পায়ে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পাবে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত কবিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।...

"আপনি যে গানটি ['আমায় সকল রকমে,···] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত

আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে ”

রবীন্দ্রনাথের পত্র নিশ্চিতমৃত্যুপথযাত্রীকে বৃথা সান্ত্বনা দান নয়, রুগ্ন কবি সম্বন্ধে অবধাবিত সত্য। দুবারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি যে প্রফুল্লতা, ধীরতা ও শান্তি দেখাইয়াছেন তাহা ভগবানে গভীর বিশ্বাস ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনের আর সব সম্বল যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ঐটুকুই হাতে থাকে, যাহার হাতে থাকে সত্যই সে পরম সৌভাগ্যবান্। মৃত্যুশয্যায় শয়ান স্যার ওয়াল্টার স্কট জামাতাকে সম্বোধন কবিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস, এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে পবিত্র জীবনেব স্মৃতি ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাইবে না। ‘সকল রকমে কাঙাল’ রজনীকান্তও শেষ শয্যায় উপনীত হইয়া একমাত্র পবিত্র জীবনের স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়াই ধীরতা রক্ষা কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সে-সময় হাসপাতালে তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথের মত মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব কবিয়াছেন। কান্তকবি স্বদেশী গানের কবি, হাসির গানের কবি, আবার ভক্তি-সঙ্গীতের কবি। কিন্তু জীবনের দুর্বহ শেষ কটি মাস প্রমাণ করিয়া দিল তাঁহার যথার্থ শক্তি কোথায়। ঐ ভক্তির মূল অস্তিত্বের গভীরে নিহিত ছিল বলিয়াই কবিকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, তুলনায় সামান্য আঘাতে অনেক অন্তঃসারশূন্য মহীরুহ ভাঙিয়া পড়ে। দুর্বহ অন্তিম এই কয়টি মাসকেই তাঁহার জীবনের অক্ষয় কিরীট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কী প্রয়োজন ছিল এই কণ্টক-মুকুটের?

বিধাতা বোধ করি মাঝে মাঝে নিজের সৃষ্টির শক্তি যাচাই করিয়া দেখেন।

২

"পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬শে জুলাই (১২৭২, ১২ই শ্রাবণ) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন তখন কাটোয়ার মুনসেফ।"

রজনীকান্ত মূলতঃ পাবনার অধিবাসী হইলেও রাজসাহীর লোক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, তিনি নিজেও সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল ছিলেন, সেই সূত্রে রাজসাহী তাঁহার আপন স্থান হইয়া উঠিল। কালক্রমে তিনি রাজসাহীর প্রধান অলঙ্কারে পরিণত হইলেন।

রজনীকান্ত প্রভূত মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল-কলেজের পাঠে কখনও মনোযোগী ছিলেন না—তাই পরীক্ষাগুলি কোন-রকমে পাশ করিয়া রাজসাহী শহরে ওকালতি ব্যবসা সুরু করিলেন।*

ওকালতি আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে আরম্ভ হইল প্রবল সাহিত্য-সাধনা। একটা পেশা, অন্যটা নেশা। নেশার কাছে পেশা পারিবে কেন? এই বিসদৃশ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎ-কুমারকে লিখিতেছেন—

---

*	১৮৮৩	এণ্ট্রান্স, তৃতীয় বিভাগ	কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল, ১৭ বৎসর বয়স
	১৮৮৫	এফ. এ. দ্বিতীয় বিভাগ	রাজসাহী কলেজ
	১৮৮৯	বি. এ.	সিটি কলেজ
	১৮৯১	বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ	সিটি কলেজ

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ তুর্লজ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

মধুসূদনও এই রকমটি লিখিলে লিখিতে পারিতেন। ওকালতির সাহারায় সাহিত্য ও সঙ্গীতের উৎস অবলম্বন করিয়া তিনি দিনগত পাপক্ষয় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যরসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনিও রজনীকান্তের মত অন্য জেলার লোক হইয়াও রাজসাহীর অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। অক্ষয়কুমার পেশায় উকিল, নেশায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্, তার উপরে সাহিত্যিক। তাঁহার কাছে উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইয়া রজনীকান্ত সাফল্যের পথে চলিলেন। এই রাজসাহী শহরেই আর তুইজন ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাঁহাদের প্রভাব অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জলধর সেন।

রাজসাহীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসিবার সঙ্গেই রজনীকান্ত রাজসাহী শহরের 'উৎসবরাজে' পরিণত হইলেন। সাহিত্যসভা, গানের মজলিশ, লাইব্রেরি, সাহিত্য-সম্মিলন, সর্বত্র রজনীকান্তকে চাই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদায়- বা সংবর্ধনা-সভায় গান লিখিয়া দিতে রজনীকান্তকে চাই।

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন

একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের (মৈত্রেয়) বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন একখানি চেয়ার টানিয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।"

—জলধর সেন

অকালে অকস্মাৎ যে-কোন উপলক্ষ্যে গান বাঁধিয়া দিতে ও গান গাহিয়া আসর মাত করিতে রজনীকান্তকে চাই। ক্রমে তিনি রাজসাহীর আনন্দ, উৎসাহ, প্রাণ হইয়া উঠিলেন। এমন লোককে 'উৎসবরাজ' বলিয়া বোধ করি অন্যায় করি নাই।

এইভাবে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ওকালতির নেশায় পেশায় যখন তাঁহার জীবন চলিতেছিল এমন সময়ে ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁহার গলায় ক্যানসার রোগ দেখা দিল। এবারে শুরু হইল তাঁহার জীবনমরণের দ্বন্দ্ব, আরম্ভ হইল দুরূহ সৌভাগ্যের মুকুট-ধারণের পালা।

জীবনের শেষ কয় মাস মেডিকেল কলেজে কাটাইয়া দীর্ঘ দেড়

বৎসর রোগভোগের পরে ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রজনীকান্ত সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

মেডিকেল কলেজে বাসকালে দেশের ছোট বড় অসংখ্য লোকের যে স্নেহ-করুণা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কান্তকবির রচনা দেশের মনকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যে লিখিয়াছিলেন—

'ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ'

তাহা আদৌ অলীক বা অত্যুক্তি নয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি ভূস্বামীগণ, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী, সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীগণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মৃত্যুপথযাত্রীর পথ সুগম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর এ সহৃদয়তা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অবসিত হয় নাই। প্রথমোক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তির বদান্যতা স্বর্গত কবির অনাথ পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর কলহ সর্বথা সত্য নয়।

৩

রজনীকান্তের সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নহে। মৃত্যুর পূর্বে তিনখানি এবং মৃত্যুর পরে পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।*

---

* ১. বাণী (কাব্য)। ১৯০২
২. কল্যাণী (কাব্য)। ১৯০৫

তাঁহার সমস্ত রচনাই পদ্যে, তাহার অধিকাংশই আবার গীত। গীত বা গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার প্রধান বাহন বলা যাইতে পারে।

তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, ভক্তিমূলক, স্বদেশী গান ও হাসির গান। অমৃত ও সদ্ভাব-কুসুম গান নয়, নীতিকবিতা, কবির স্বীকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত।

লেখকের বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে মুখ্য ও গৌণে প্রভেদ করা সমালোচকের একটি প্রধান কর্তব্য। গোড়াতে এই ভাগটা করিয়া লইলে পরিণামে অনেক ভুল বোঝার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণ হিসাব করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভক্তিমূলক গানেই কবির প্রতিভার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ, ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রবণতা। স্বদেশী গান, হাসির গান ও নীতিকবিতা তুলনায় গৌণ। গৌণের বিচার আগে সারিয়া লওয়া যাইতে পারে, স্বভাবতঃই তাহা সংক্ষিপ্ত হইবে।

৩. অমৃত (নীতিকবিতা)। ১৯১০
মৃত্যুর পরে প্রকাশিত
৪. আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসঙ্গীত)। ১৯১০
৫. বিশ্রাম (কাব্য)। ১৯১০
৬. অভয়া (কাব্য)। ১৯১০
৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা)। ১৯১৩
৮. শেষ দান (কাব্য)। ১৯২৭

রাজসাহীতে দ্বিজেন্দ্রলালেব সহিত পরিচয় রজনীকান্তকে হাসিব গান বচনায় প্রেরণা দেয়, স্পষ্টতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান তাঁহার আদর্শ। সাহিত্যে হাসির সীমানা কালে কালে ও দেশে দেশে বদল হইয়া থাকে। এক দেশ যে বিষয়কে হাস্যকব মনে কবে অন্য দেশ তাহা নাও কবিতে পারে, এক যুগ যে বিষয়কে হাস্যকর মনে করে অন্য যুগ তাহা না করিতেও পাবে। দ্বিজেন্দ্রলালেব হাসিব গানেব জৌলুস এক সময়ে যেমন ছিল এখন আব তেমন নাই। যুগাত্যয়ে রুচির বদল হইয়াছে, সে যুগের তুলনায় বর্তমান কাল কিছু গম্ভীব ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছে—সাহিত্যে হাসি এখন সম্পূর্ণ taboo না হইলেও তাহার স্থান এখন সঙ্কীর্ণ। বজনীকান্তেব হাসির গান সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বা রজনীকান্ত কাহাবও হাসিব গান এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পুনরায় যুগাত্যয়ে যে হাসিব গানেব আদর বাড়িবে না এমন বলা যায় না। তবে দুজনেব হাসির গানেব মধ্যে তুলনা করিলে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্রলালেব হাসিব গানেব সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অধিক হইলেও উৎকর্ষে বজনীকান্তেব হাসিব গান ন্যূন নহে। তাঁহার হাসিব গান মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বাবা প্রভাবিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক জায়গায় রজনীকান্তের জিত—তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।

৪

স্বদেশী যুগে স্বদেশী গান লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি বোধ হয় ছিলেন না। রজনীকান্তও লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রবল প্রভাবটা সেই যুগের হাওয়ার, তার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের। রজনীকান্তের স্বদেশী গানে অগ্রজ কবিদ্বয়ের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান সর্বত্র লিরিক্যাল, গানের সীমানা ত্যাগ করিয়া বক্তৃতার সীমানায় কখনও পদার্পণ করে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান সর্বত্র oratorical, তাহা যেন গানে বক্তৃতা। এগুলির তৎকালীন জনপ্রিয়তার মূল এখানে, বক্তৃতার প্রেরণা যেমন সহজ, গানের প্রেরণা তেমন নয়। আবার এগুলির বর্তমান অনাদরের মূলও এখানে, বক্তৃতা যত শীঘ্র পুরাতন হয় গান তেমন হয় না। এখন রজনীকান্তের স্বদেশী গানে এ দুটি গুণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই—

এ রচনার ছাঁচ লিরিক্যাল, সুরে গীত না হইলেও এ গান।

আবার—

রাম-যুধিষ্ঠির ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন ভীষ্ম শরাসন টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।

এ রচনা "মিশ্র পয়োজ-কাওয়ালী" রাগিণীতে গীত হইলেও লিরিক নয়, বক্তৃতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের আদর যে কমিয়াছে, স্বদেশী যুগের অবসান তাহার কারণ নয়--উহার বক্তৃতাত্মক ছাঁচটাই কারণ। ঐ একই কারণে রজনীকান্তের স্বদেশী গানের সে আদর আর নাই, কাল ও ছাঁচ দুই-ই চিরকালীন সমাদরের অন্তরায়।

৫

রজনীকান্তের নীতিকবিতাগুলির বর্তমান অনাদরের কারণ বুঝিতে পারি না। এ গুলি স্পষ্টতঃ (কবি কর্তৃক স্বীকৃতও বটে) কণিকার আদর্শে লিখিত হইলেও ইহারা সরসতায়, ভূয়োদর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ। খুব সম্ভব অনাদরের কারণ হইতেছে সাধারণ ভাবে রজনীকান্তের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকের অবহেলা ও বিস্মৃতি। কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলির পরেই, হাসির গান ও স্বদেশী গানের উপরে, নীতিকবিতাগুলির আসন।

৬

বাংলা দেশের ভক্তিসাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিত-প্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সঙ্গীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সঙ্গীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তিসাধনার সমান্তরালে একটি সঙ্গীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসঙ্গীত—সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রজনীকান্তের কান্তপদাবলীও এই ভক্তিসঙ্গীতধারার অন্তর্গত। ভক্ত ও ভগবান্ সম্পর্কিত নূতন কোন তত্ত্ব বা পন্থা তিনি উদ্ভাবন করেন নাই; বোধ করি ভক্তির প্রকৃতি এই যে তত্ত্ব বা নূতন পন্থার দিকে তাহা ঝোঁকে না, চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। কাজেই কান্তপদাবলীর তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা নিরর্থক। ভক্তির অকৃত্রিমতাই উহার প্রধান সম্পদ।

বাণী ও কল্যাণী হইতে অনেক পদ উদ্ধার করিয়া বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজন আছে মনে করি না। ভক্তির মূলে আছে বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার বিশ্বাসদ্যোতক সঙ্গীতের সংখ্যাও প্রচুর।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

কিংবা—

তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে ;
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।...
তাই বলে ডাকি যাহা প্রাণ চায়
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়—

ইহাই তাঁহার ভক্তির অন্তর্নিহিত কথা। বিশ্বাস ও ভক্তি প্রাণে থাকিলে ভক্তের সংসার-পথ সুগম হইয়া আসে, তখন মৃত্যুতেও সে অনায়াসে বলিতে পারে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।...
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তখন মৃত্যুকেও 'তোমার রসাল নন্দন' বলিয়া মনে হয়।

কান্ত কবির ভগবদ্‌বিশ্বাসে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না বলিয়াই তিনি দুর্বহ পীড়ার অন্তিম মাস কয়েকটি গৌরব-কিরীটের মত অনায়াসে শিরে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ কথা বলিলে কুটিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে না যে, কান্তকবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তিপদাবলীর জাহ্নবীতে যে একটি চির-সলিলা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।*

---

* এই প্রবন্ধরচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্গত রজনীকান্ত সেন পুস্তিকার সাহায্য পাইয়াছি।

কবি প্রিয়ম্বদা দেবী

১৮৭১—১৯৩৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলি এমন সহজ স্বচ্ছ, এমন অনাড়ম্বর, বিধবার দেহের মত সেগুলি এমন নিরলংকার যে প্রথম অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সেগুলিকে অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়। শরৎকালের প্রভাতে ঘাসের মধ্যে মুক্তা ছড়াইয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকেই শিশিরভ্রমে সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিবে না বলিয়া আশঙ্কা। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলির দিকেও এ পর্যন্ত পাঠকসাধারণ ফিরিয়া তাকায় নাই, শিশিরসঞ্চয়ী ঘাসের মধ্যে মুক্তার মত এই ক্ষুদ্রকায় নিটোল কাব্যকণাগুলি সম্পূর্ণ অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে।

শিল্পগত স্বচ্ছ অনাড়ম্বরতার প্রতিষেধক হইতে পারিত, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার সংখ্যা যদি যথেষ্ট হইত। সংখ্যাগত প্রাচুর্য শিল্পগত লঘুতার পরিপূরক। কিন্তু সেদিকেও আশা করিবার বিশেষ-কিছু নাই; পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি নিতান্তই মুষ্টিমেয়। পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার ইহাও একটা হেতু।

ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার আলোচনা উপলক্ষে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গেই আর্নল্ডের স্থান, তবে যে তাঁহার আসন সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয় তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর; টেনিসন ব্রাউনিং বা সুইনবার্নের স্তূপীকৃত কীর্তির পাশে আর্নল্ডের কবিকৃতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর দেখায়। বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কবিরা নূতন

পথ রচনা করিয়া অবতীর্ণ হন; পথটা অপরিচিত বলিয়া কবির বিরুদ্ধে পাঠকের মনে প্রথমে একটা প্রতিকূলতা থাকে, সেই প্রতিকূলতা কাটিয়া রচনার সহিত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অনুকূলতা আসে, প্রাচুর্য সেই ঘনিষ্ঠতার অবকাশ দেয়। কিন্তু রচনার পরিমাণ স্বল্প হইলে ঘনিষ্ঠতার অভাবে কবিব সম্বন্ধে পাঠকের সুবিচার করিবার সুযোগ ঘটিয়া ওঠে না; অর্থাৎ পাঠকে ধারের সঙ্গে ভাব চায়, আর্নল্ডের কবিকৃতিতে ধার যথেষ্ট, কিন্তু ভারের অভাব। টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি ধারে-ভারে পাঠকের মনে কাটিয়া বসিয়াছেন, ভারের অভাবে আর্নল্ড পাঠক-হৃদয়ে আপন প্রাপ্য স্থানটি হইতে বঞ্চিত আছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যেও ভারের অভাব। একে তাঁহার শিল্পেব মধ্যে এমন-কিছু আছে পাঠকের পক্ষে যাহার ধারণা করা কঠিন, তার উপরে পরিমাণের লঘুতা, দুয়ে মিলিয়া তাঁহার কবিতার উপেক্ষার আসর বেশ প্রশস্ত করিয়া গড়িয়াছে।

আরও একটি বিষয়। তাঁহার কবিতা কেবল পরিমাণে সামান্য নয়, শিল্পে স্বচ্ছ সহজ নয়, আকৃতিতেও অধিকাংশই অতিশয় ক্ষুদ্র। তাঁহার বেশির ভাগ কবিতাই চোদ্দ বা আঠারো ছত্রের বেশি নয়, পঁচিশ-ত্রিশ ছত্রের কবিতা অল্পই আছে, আট-দশ-চার ছত্রের কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। আকারের এই ক্ষুদ্রতাও তাঁহার কবিতার স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে একটি অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আকৃতির দৈর্ঘ্য একরকমের ভার, উহাতে পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। পাঠকে মনে করে, এত দীর্ঘ যখন নিশ্চয় কিছু বস্তু আছে। নিছক আকৃতির দাবিতেই বৃত্রসংহার-কাব্য আজ পর্যন্ত পাঠকসমাজে টিকিয়া আছে। আকারে ছোট হইলে

সংখ্যা দ্বারা পুরাইয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবপদগুলিও ছোট, কিন্তু সংখ্যার বাহুল্যে ছোটকে আর ছোট মনে হয় না। শিল্পগত স্বচ্ছতা, সংখ্যার অল্পতা এবং আকৃতির হ্রস্বতা তিনই প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, বিশেষজ্ঞ পাঠকেও তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন এমন মনে হয় না, তাঁহার কবিতার রসজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা তাঁহার কবিতার চেয়েও অপ্রচুর। মানুষের বিচারে যেমনি হোক, বিধাতা এক দিকে কৃপণতা করিয়া আর-এক দিকে পুরাইয়া দেন। প্রিয়ম্বদা দেবী এমন অ-প্রত্যাশিত ভাবে এমন-এক স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন যে, আর কোন বাঙালী লেখকের পক্ষে তাহা সম্ভব নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের একখানি কাব্যগ্রন্থে নিজের কবিতাভ্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্তত উক্ত কবিতা-কয়টি রবীন্দ্রনাথের রস-বিচারের মাপকাঠিতে পাশ-মার্কা পাওয়া। এই সান্ত্বনায় সাধারণ পাঠকের জয়ধ্বনির অভাব পূরণ করিয়া দেয়। প্রিয়ম্বদা দেবীর ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়।

পূর্বোক্ত ইতিহাসটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

"কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল। মনে হল ভালোই লিখেছি।...পড়ে দেখলাম—

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভ'রে উঠেছে। পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

"তার পর আর-একটা কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে, এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর-একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করে দিলাম এজন্য নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

"তার পর আর-একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নাম সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমায় তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।

আঁধার অম্বর পৃথ্বী, পথ চিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে, সে আজকের কথা নয়, এই ভাবেরই দু-একটি কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তবু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"আর-একটি ছোট কবিতা—

প্রভু তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার—
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মত ফুটে উঠেছে।

"আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা-কয়টি অ্যালুমিনিয়মের পাতের উপরে স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার 'লেখন' নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।"

ইহার পরে পাঠকসাধারণ যদি জয়ধ্বনি না জানায় তবে কি বিশেষ ক্ষতি আছে? এমন অভাবিত প্রশংসা কয় জন কবির ভাগ্যে জুটিয়াছে?

আগেই বলিয়াছি যে প্রিয়ম্বদা দেবীর অধিকাংশ কবিতা আকারে ক্ষুদ্র। শুধু তাই নয়, কবিতাগুলির মধ্যে এমন-একটি

সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা আছে যাহা লিরিক কবিতার চেয়ে এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার স্বভাবসংগত। লিরিক কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য একটুখানি বিস্তারের আবশ্যক, এপিগ্রামে ঠিক তাহার বিপরীত। এপিগ্রামের সংহত, সংযত কঠিনতা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয়। 'পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট' তাহাতে ভরে না, আর এপিগ্রামের নিরাভরণ সৌন্দর্য অনেক সময়েই প্রাকৃত জনের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম। এও একটা কারণ যেজন্য প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে। এপিগ্রাম-ধর্মী কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আরবার
দেবতারে দিতে পারি সর্বস্ব আমার,
তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়।

আর-একটি—

দুর্বল, বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায়!

আরও একটি—

উভয়ে সমান মম সুখ-দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ, তুমি সুখ সে আমার,
তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখ-দুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে।

আবার একটি—

সুখ শুধু এতটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ;
সুখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ভার।

এমন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে।

লিরিকের উদ্ভব হৃদয়ে, সুখ-দুঃখের বেদনায় ; এপিগ্রামের উদ্ভব মস্তিষ্কে, ভাল-মন্দের বিচারে ; হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা ছাড়া পাইয়া লিরিকে বিস্তারিত হইয়া যায় ; ভাল-মন্দের বিচার সংহত হইয়া এপিগ্রামে দানা বাঁধিয়া ওঠে ঃ লিরিক নীহারিকা, এপিগ্রাম নক্ষত্র। একই কারণ সাগর হইতে দুয়ের সৃষ্টি হইলেও কার্যত দুই ভিন্ন। দুয়ের কার্য ও ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রিয়ম্বদা দেবীর অনেক কবিতার একটি ত্রুটি এই যে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদনাকে শিল্পের শাণযন্ত্রে চড়াইয়া কাটিয়া-কুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া একেবারে তাহার সূক্ষ্মতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লিরিক-বেদনার পক্ষে এটি ত্রুটি বলিয়া মনে করি ; বেদনার সঙ্গে বেদনার ভার অত্যাবশ্যক, সেই অত্যাবশ্যকটুকুও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই একটি মাত্র ত্রুটিই তাঁহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয়াছে, বাকি সবই প্রশংসার।

২

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের মতই তাঁহার জীবন ঘটনাবিরল, বাহুল্য-বর্জিত এবং একটি চরম বেদনার মধ্যে সংহত। ক্ষেত্রান্তর হইতে তাঁহার জীবনকথা উদ্ধার করিয়া দিলাম—

"ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরেই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) ঘটে।

"শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার মুদ্রিত প্রথম রচনা। পর বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে ভারতীতে তাঁহার গদ্য পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—

১ রেণু (কাব্য): ১.৯.১৯০০। পৃ ৬৯
২ তারা (শোক কবিতা): ১৮.১১.১৯০৭। পৃ ৩৭
৩ পত্রলেখা (কাব্য): ১০.১.১৯১১। পৃ ১৫৮
৪ অংশু (কাব্য): শ্রাবণ ১৩৩৪ (১৯২৭)। পৃ ১২৫
৫ চম্পা ও পাটল (কাব্য): ১৯৩৯। পৃ ৩৮

"ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'অনাথ' (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে, (দ্র° ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১)।"*

* বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেণু, পত্রলেখা, অংশু এবং চম্পা ও পাটল কাব্য চতুষ্টয়।

৩

রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর, সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়।...বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা, কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।..."

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যূথী মালতী ফুলের মত বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাব্যে এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ফুল কেবল যূথী মালতী জাতের নয়, তার মধ্যে চম্পা পাটল গোলাপ কৃষ্ণচূড়া বলরামচূড়া কামিনী প্রভৃতি নানা জাতের নানা রঙের তীব্র সৌগন্ধের ও উগ্রবর্ণের ফুলেরও অভাব নাই। উপমা ও উপাদানকে অনুসরণ করিয়া কবির অবচেতন মনোলোকে প্রবেশ করিবার

সাহিত্যিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে পারিলে এই পুষ্পোল্লেখবাহুল্য হইতে কোন গুপ্ত সত্য উদ্ধার করা হয় তো একেবারে অসম্ভব হইত না। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকুই বলিলে চলিবে যে ফুলের মত এমন সুকুমার, এমন স্পর্শকাতর অথচ এমন সুন্দর আর-কিছু আছে কি না সন্দেহ। একমাত্র ভালবাসার সঙ্গেই ফুলের তুলনা চলে। 'দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা' এ কথা ফুল সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফুলের ও প্রেমের এই সাধর্ম্য লক্ষ্য করিয়াই কবি যেন পুষ্পবৃষ্টিতে নিজের কাব্য ছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার চোখে ফুলই প্রেম; তাঁহার ফুলের কাব্য নামান্তরে প্রেমের কাব্য। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতে কবি বুঝিয়াছেন যে. প্রেম ফুলের মতই সুন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ; আরও বুঝিয়াছেন যে, ফুল ঝরিয়া গেলেও তাহার গন্ধ বাতাসে থাকিয়া যায়, প্রেমাস্পদ গত হইলেও প্রেমের উত্তর-রাগ 'প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎ সন্ধ্যামেঘে' লাগিয়া থাকে। সেই পুষ্পসৌরভের, প্রেমের স্মৃতির, প্রেমের বেদনার কাব্যই যে তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ফুল চিন্ময়, তাহা প্রেমের প্রতীক।

৪

দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই অসহ, কিন্তু যাহারা কল্পনা-প্রবণ, অনুভূতি যাহাদের তীক্ষ্ণ, তাহাদের পক্ষে না জানি আরও কত অসহ। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি নিছক ক্ষতি নয়, তাহাদের হিসাবের খাতার বামে ক্ষতিপূরণস্বরূপ জমার অঙ্ক একটা দেখা যায়। দুঃখের অনুভূতিকে তাহারা শিল্পে মূর্তি দিয়া থাকে, তখন

সেই মূর্তি সকলের অনুভবযোগ্য দর্শনযোগ্য হইয়া ওঠে। সাধারণ লোকে অন্ধভাবে দুঃখের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; শিল্পীর কলমে দুঃখের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিলে তবেই তাহারা দুঃখকে দেখিতে পায়, শিল্পীর দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের দুঃখের দোসরকে দেখে। সুখ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতার বিন্যাসে সাধারণের দুঃখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন।

রেণু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বলিয়াই হোক, আর শোকের কারণ অতিশয় নিকটবর্তী বলিয়াই হোক, সবগুলি কবিতা সুষম শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। তবে যেসব উপাদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা গঠিত, রেণু-কাব্যেই সেগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল তন্তুতে তাঁহার শ্রেষ্ঠকবিতাগুলি রচিত, রেণু তাহার ব্যতিক্রম নয়। রেণুর বর্ষা বিরহিণী। শরৎ প্রকৃতি স্নেহময়ী মাতা। আবার দেখি হেমন্তের হিমানী, সেও বিরহিণী। কবির বিদ্ধ হৃদয় শরাহত কুরঙ্গের মত ছুটিয়া গিয়া যে সরোবরতীরে উপনীত হইয়াছে তাহা প্রকৃতির অতল স্নেহ ও শান্তি।

পত্রলেখা-কাব্য পূর্ণ পরিণত, হয়তো এখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য কিংবা বলা উচিত যে তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা পত্রলেখার অন্তর্ভূত, কেননা, তাঁহার এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যের প্রকৃতিগত কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সবই যেন এক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-বেদনার ক্রৌঞ্চীগীতি।

পত্রলেখায় আসিয়া শোক শ্লোক হইয়া উঠিয়াছে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে বাস্তব ঘটনা হইতে যে দূরত্বের আবশ্যক, যে বিবিক্ত ভাব অনিবার্য, পত্রলেখা-কাব্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত।

প্রকৃতি ও মানুষের যে যুগল তন্তুর বিষয় আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সেই বুনানি আরও নিপুণ, দুইকে এক বলিয়া মনে হয়।

আর-এক দিকে দেখি রেণু কাব্যের অপেক্ষাকৃত লিরিক বিস্তৃতি ঘনতর পিনদ্ধ হইয়া সংহত এপিগ্রামের সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে, নীহারিকা নক্ষত্রে পরিণত। কাব্যের এই ক্রমবর্ধমান সংহতি সম্বন্ধে লেখিকা সচেতন, তাই কৈফিয়তস্বরূপ যেন বলিয়াছেন—

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন অর্থভরা অজস্র ভাষায়।
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই
অশ্রুজলে কোনো কথা খুঁজিয়া না পাই।

আবার—

এক বিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি
অমনি বন্যার মত আসে দ্রুত নামি
অনন্ত শোকের মোর অবাধ প্লাবন
ভাঙিয়া ধৈর্যের বাঁধ ভাসাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ জড় পাষাণের মত
প্রবল উৎসের মুখ রুধিয়া নিয়ত।

তাঁহার মৌন ঋণাত্মক নয়, তাঁহার বাক্যদীনতা বেদনার গভীরতা-সূচী ; মহাকাশের স্তব্ধতা যেমন শূন্য নয়, নির্জনতা যেমন রিক্ত নয়, এ-ও তেমনি। পত্রলেখা-কাব্যে দেখিতে পাই যে, মৃত্যুর পরে দয়িতের সহিত পুনরায় মিলন হইবে এইরূপ একটা আশা দেখা দিতেছে এবং সেই আশার সূত্রেই ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস জাগিতেছে, কবির কাছে এখানে প্রেম ভগবৎবিশ্বাসের পূর্বসূত্র।

অংশু কাব্যখানি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হইলেও 'কবিতাগুলি প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বের রচনা'। পত্রলেখা ১৯১১ সালে

প্রকাশিত হইলেও কবিতাগুলি যে আরও আগে রচিত অনুমান করা অনুচিত হইবে না। পত্রলেখার কবিতাগুলির সঙ্গে অংশু-কাব্যের শিল্পগত প্রভেদ না দেখিতে পাইলেও পরিপ্রেক্ষিত-গত পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। শোকের কারণ বেশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আগেকার সে ক্ষতিবোধ নাই, তবে ক্ষতচিহ্ন আছে, সেই ক্ষতচিহ্ন মনে একপ্রকাব বেদনাব স্মৃতিময় ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে। বোধ কবি এইজন্যই অংশুব অনেকগুলি কবিতা নৈর্ব্যক্তিক ও তত্ত্ব-আভাসিত। ব্যক্তিগত ব্যথা হইতে কবির মন তত্ত্বে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, ব্যথাশ্রয়ী মন এখানে তত্ত্বাশ্রয়ী। কিন্তু তত্ত্ববিন্যাস বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রতিভার স্বরূপ নয়, তাই অচিবে নূতন আশ্রয় সন্ধান করিয়া বাহিব করিয়াছে। আগেকার কাব্য প্রকৃতি ও মানুষের টানা-পোড়েনে বোনা, অংশুর অনেক কবিতার একটি সূত্র প্রেম, আর-একটি সূত্র পৌরাণিক দেবদেবী এবং পৌরাণিক নরনাবী। একদা ব্যথার সান্ত্বনার জন্য যেমন প্রকৃতির কাছে কবি গিয়াছিলেন, এখানে তেমনি গিয়াছেন পৌরাণিক যুগের মহত্ত্বে ও ত্যাগোজ্জ্বল চারিত্র্যে; উদ্দেশ্য অভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, এই মাত্র। এই শ্রেণীব কতকগুলি কবিতা পড়িয়া মনে হয় কবি যেন কতক পরিমাণে নিজের বেদনা ও বিচ্ছেদের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অপরের ব্যথার অপূরণীয় তীব্রতা নিজের ব্যথাকে কতক পরিমাণে সুসহ করিয়া তুলিয়াছে।

চম্পা ও পাটল প্রিয়ম্বদা দেবীর শেষ কাব্য, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এ বইখানা তাঁহার কবিজীবনের উপসংহার। জীবনান্তের ব্যথা যেন সমে আসিয়া আবার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে,

দিনান্তের সন্ধ্যাকাশে যেন সূর্যোদয়েরই সমারোহ, তবু ঠিক এক নয়, ভালো করিয়া নিরিখ করিলেই ক্লান্তির আভাস ধরা পড়ে। প্রভাতের সে নবোদ্যম কই? ভৈরবী আর পূরবী দুইই ব্যাকুল করা রাগিণী, কিন্তু সে ব্যাকুলতার জাত যে ভিন্ন।

ব্যথার উপসংহারে ব্যথার ভূমিকার উপাদানগুলি আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পৌরাণিক তত্ত্বর পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থা ও অনুরাগের তত্ত্ব ফিরিয়া দেখা দিয়াছে; ফুলের বাগানে ফুলই ফোটে।

আরও একটি বিষয় কবির অবসন্ন জীবনান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। চারি দিকের নরনারীর জীবনলীলার প্রতি এমন একটি বিবিক্ত আগ্রহ পরিস্ফুট যাহা কেবল বিদায়-চেতন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সংখ্যায় অল্প, আকারে ক্ষুদ্র, অলংকারে দীন, ভাষায় স্বচ্ছ এবং ভাবে ও রূপে বিচিত্র নয়। এগুলি এমন মৃদু, এমন বাক্‌কুণ্ঠ, এমন অর্ধোক্ত—মনে হয় এ যেন কবির স্বগতোক্তি; বিজন মধ্যাহ্নে পল্লবে নিলীন ঘুঘুর স্থগিত বিলাপে যে ক্লান্ত .ব্যাকুলতা, তাই যেন এ কবিতাগুলির মর্মে মর্মে জড়িত। এমন রচনার সমাদর হওয়াই কঠিন, বাংলা কাব্যসৃষ্টির বর্তমান অবস্থায় তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবু ব্যথা যদি গভীর হয়, অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, আর সেসব যদি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করিয়া থাকে, তবে সে রসসৃষ্টির মার নাই। আধুনিক পাঠক যদি উপেক্ষা করিতে পারে, তবে এ কাব্যও অপেক্ষা করিতে

পারিবে। আধুনিক আর সবই করিতে পারে, কেবল অপেক্ষা করিতে অক্ষম; আজকার দিনের সঙ্গেই যার গাঁটছড়া বাঁধা, আজকার দিনের সঙ্গেই যে তার সহমরণ অবশ্যম্ভাবী। শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন চাকরের মতই নূতন বিষয়কে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য মানুষের ব্যথার মতই পুরাতন, সেইজন্যই চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্বারা সূচনা করিয়াছিলাম আবার তাঁহার উক্তিতেই শেষ করি, "বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম"।

কবি সতীশচন্দ্র রায়

১৮৮২—১৯০৪

যে কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক তাঁহাদের রচনায় প্রতিভার আভাসমাত্র রাখিয়া অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি সতীশচন্দ্র রায় অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের সরস্বতী যদি আজ বর দিতে উদ্যত হন যে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যে-কোন একজনকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সাহিত্যলীলাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে সতীশচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কামনা করি। প্রবাসী পত্রিকায় তিন বন্ধুর একখানি ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম। এই তিন বন্ধু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় কবি সতীশচন্দ্র রায়। ভাগ্য এই তিন প্রতিভাবান্ যুবককে বন্ধুত্বসূত্রে একত্র করিয়াছিল, আবার তিনজনকেই অকালে হরণ করিয়া লইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরে গেলেন, অজিতকুমার বত্রিশ বৎসরে, আর সতীশচন্দ্রের বয়স বাইশ বৎসরও পূর্ণ হইতে পায় নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। কিংবা বিস্মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয়, তাহাতে মনে হইতে পারে একসময়ে তিনি বিশ্রুত ছিলেন। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে আভাসিত হইয়াই তিনি অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি পড়িবার আগেই তাঁহার নিমজ্জন ঘটিয়াছে। সতীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের শুক্লদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা।

দু-চারজন সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি ওই ক্ষীণ চন্দ্রকলায় পূর্ণিমার আভাস দেখিয়াছিল। এই দু-চারজনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধান।

সতীশচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে অজিতকুমার 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র রায় বরিশালে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। জমিদারির ভগ্নদশায় সতীশ সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হন। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ইনি বরাবর অধ্যয়ন করিয়া সেখান হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।...পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।"

সতীশচন্দ্রের জীবনকালে তাঁহার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে 'গুরুদক্ষিণা' নামে একটি ক্ষুদ্র কথা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। আরও কিছুকাল পরে, ১৩১৯ সালে তাঁহার বন্ধু অজিতকুমারের প্রযত্নে ও সম্পাদনায়,

তাঁহার কয়েকটি পদ্য ও গদ্য রচনা 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাবলীর নিবেদনে সম্পাদক সতীশচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহার অল্পবয়সের বহু রচনা ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনটাই তেমন আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠে নাই। কলিকাতায় থাকিতে এবং বোলপুরে আসিবার পর হইতে তিনি যে-সকল রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহারাই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কয়েকদিনের মাত্র একটি ডায়ারি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারি মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনখানি এবং অন্তরের প্রতিকৃতিটি বড় স্বচ্ছ এবং সুন্দর ভাবে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়ারির মধ্যে ব্যক্তিগত কথা থাকিলেও তাহা সেই কারণে যথাযথ ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইল।"

সতীশচন্দ্রের রচনার পরিমাণ সামান্য—পৌরাণিক উতঙ্কের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গুরুদক্ষিণা নামে একটি কথা, আর রচনাবলীতে সংগৃহীত গদ্য-পদ্য রচনা। শেষোক্ত গ্রন্থখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭৩, প্রথমোক্তখানির মাত্র ৫২। গুরুদক্ষিণা এখনও কিনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু রচনাবলী সম্পূর্ণ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ শান্তিনিকেতনের পুরাকালের এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক-অধ্যাপকের রচনাবলী পুনঃপ্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন—ইহা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটি মহদুপকার বিশ্বভারতী করিবেন; আর প্রসঙ্গতঃ শান্তিনিকেতনের এই নিষ্কাম কর্মীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে।

২

সতীশচন্দ্র জীবনে খ্যাতিলাভ করিয়া যান নাই, খ্যাতি অর্জন করিবার মত জীবনের দীর্ঘতা পান নাই, অশরীরী কবিকল্পনাকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করেন নাই—এ সমস্ত নিদারুণ সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি মহৎ সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল—তিনি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এমন স্নেহমিশ্রিত শ্রদ্ধা আর কোন তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের নিকট পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে "বন্ধুস্মৃতি" অধ্যায়ে সতীশচন্দ্রের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটিই 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকারূপে সংযোজিত। কবিগুরুর শেষ বয়সের 'বনবাণী' গ্রন্থের "শাল" শীর্ষক কবিতায় যে তরুণ বন্ধুর উল্লেখ আছে তিনি এই সতীশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যপ্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহার মুখে সতীশচন্দ্রের অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে 'বনবাণী' প্রকাশের সময় বড় অল্প নহে—রবীন্দ্রনাথের মনে সতীশচন্দ্রের স্মৃতি এই দীর্ঘকালের উপরে বিতানিত হইয়া আছে। অকালে পরিসমাপ্ত-জীবন এই তরুণ কবির স্মৃতি কবি-বনস্পতির শাখায় শাখায় এক অলৌকিক আলোকলতার মত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তরুণ কবি ও মহাকবির এই ভাবসান্নিধ্য ভবিষ্যতের কবিদের অনুসন্ধিৎসু কল্পনার জন্য এক লোভনীয় উপজীব্য হইয়া রহিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের কাজে

আত্মসমর্পণ করিতে পারে, এমন কর্মী বিরল। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম, তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীত স্বরে কহিল, আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য? তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল। ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।"

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে সংকল্পের শক্তি অনেকটা চলিয়া যায়, কিন্তু সতীশচন্দ্রের কল্পনার সহিত সংকল্পের দৃঢ়তা যুক্ত হইয়াছিল, যে-কল্পনা আপাত-ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভবিষ্যতের মহৎ সম্ভাবনাকে দেখিতে সমর্থ হয়, যে-সংকল্প প্রাত্যহিক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে, সতীশচন্দ্রে তাহার দুইটিই প্রচুর ছিল। সেই জন্য কেবল যে তিনি তৎকালীন ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন তাহাই নয়, বিদ্যালয়ের মহৎ ভবিষ্যৎকেও অন্তরে লালিত করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের তৎকালীন জীবনচর্যা সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিতেছেন, "এই আশ্রমের একপ্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে,

সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্‌ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।"

পূর্বে যে 'বনবাণী'র "শাল"-শীর্ষক কবিতার উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সেই শালতরুশ্রেণীর নিম্নশায়ী কঙ্করখচিত পথের এই স্মৃতিটিই কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের আলোচনা করিতে বসিয়া এত বিস্তৃত আকারে তাঁহার আশ্রমবাসের কথা বলিতেছি এই কারণে যে, তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি বুঝিবার পক্ষে আশ্রমবাসের স্মৃতিটি অপরিহার্য। শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তর ও উদারতর আকাশ, এখানকার চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও রবির কিরণ তাঁহার প্রতিভাকে ধীরে ধীরে পরিণত করিয়া তুলিতেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রতিভার সম্বন্ধ নিবিড়। এই সম্বন্ধটুকু বুঝাইবার জন্যই এত চেষ্টা। সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' কাহিনীর আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্লনবীন হৃদয়ে মিলিয়া গানের মতো

করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।” কেবল ‘গুরুদক্ষিণা’ মাত্র নয়, এই উক্তি তাঁহার সমস্ত গদ্য পদ্য রচনা সম্বন্ধেই সত্য। প্রতিভাস্ফূর্তির প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে না আসিলে তাঁহার রচনা কি আকার পাইত জানি না—কিন্তু যথাসময়ে আসিয়া পড়াতে বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের রচনার পাঠকদের পরম সৌভাগ্য এই যে, তাঁহার ডায়ারির কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার রচনার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করিয়া এই কয়েকটি পত্রখণ্ড বিদ্যমান। ইহার সাহায্যে তাঁহার প্রতিভা হইতে রচনায়, রচনা হইতে প্রতিভায় অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারা যায়, এবং সেই কারণে সমালোচকের কাজও অনেকটা সরল হইয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির প্রারম্ভে দেখিতেছি তিনি লিখিতেছেন—“আপনাকে পাইতে হইবে। আপনাকে না পাইলে জীবন মিথ্যা। আমি কুলক্রমাগত সংস্কারের সমাজের দাস হইয়া মূর্খের মত কেন ফিরিব? আমি পরের উপদিষ্ট এক অগম্য অননুভূত কাল্পনিক ঈশ্বরকে ‘ঈশ্বর ঈশ্বর’ করিয়া আত্মার ধার কেন কুণ্ঠিত করিব? আমি আপনাকে জানি।” ইহা লিখিবার সময়ে সতীশচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর। এ বয়সে এ জাতীয় উক্তি আমাদের দেশে বিরল নয়—কলেজের ছাত্রদের অনেকের ডায়ারিতেই এই শ্রেণীর উক্তি লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু বাস্তবের ঘা খাইতেই তাহাদের মাথা হইতে আপনাকে পাওয়ার ভূত নামিয়া গিয়া চাকুরি পাওয়ার ব্রহ্মদৈত্য চাপিয়া বসে। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বেলায় গোড়া হইতেই ব্রহ্মদৈত্য নামিয়া গিয়াছিল—কাজেই তাঁহার ক্ষেত্রে এই উক্তিকে গতানুগতিক ভাবে না দেখাই উচিত। কিন্তু আর-এক আশঙ্কা ছিল—সে

হইতেছে morbidityর আশঙ্কা। অল্পবয়সের অত্যধিক অন্তর্মুখিতা মানুষকে অনেক সময়ে বাস্তববোধবিবর্জিত করিয়া morbid করিয়া তোলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অবিরল।

রবীন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রের মনের এই গতি যেন টের পাইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের ডায়ারিতে দেখিতেছি—"গুরুদেব বলিয়াছেন আত্মালোচনা করিতে গিয়া morbid হয়ে পোড়ো না। morbid কেন হইব? আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? আমার সহজ আনন্দকে কেন দমাইতে যাইব? কেন morbid হইব? জীবনের রস কি আমি কিছুমাত্র পাই নাই? হায়! প্রতিদিন আমি কি-একটি সৌন্দর্যের কাছে আসিতেছি!···গুরুদেবের স্নেহই তো আমার জীবনের উপরে সূর্যরশ্মির মতো পড়িয়াছে। তাঁহার সেই অপরাজিতা ফুলের মতো কোমলতাপূর্ণ চক্ষু দুটি আমার হৃদয়ের ভিতরের সহস্রদল পদ্মের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। আমার প্রাণে মনে ভাবে কল্পনায় সংসারে সর্বত্র তাঁহার স্নেহকিরণ পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র বলিতেছেন, তাঁহার morbid হইয়া না পড়িবার কারণ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ। আর একটি কারণও তিনি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—প্রকৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক, সহজাত প্রীতির আকর্ষণ। এই দুটি কারণকে যথাযথ না বুঝিলে তাঁহার জীবন ও কাব্য বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনের উক্তিই জানিতে পারিলাম। এবার দ্বিতীয় কারণটির বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে।

৩

ছেলেবেলাতে বালকদের মনে প্রকৃতি একপ্রকার অন্ধ আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারের সৌভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ছেলেমেয়ে রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডস্বার্থ হয় না বলিয়া এই আকর্ষণের ব্যাপকতা সকলে জানিতে পায় না। কিন্তু একথা একপ্রকার সত্য যে, ওয়ার্ডস্বার্থ বা রবীন্দ্রনাথ যে-আকর্ষণ দুর্নিবার ভাবে অনুভব করেন, অন্য ছেলেমেয়েরাও তাহা নিস্তেজভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির আকর্ষণ ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহাদের হৃদয় সংসারের অভিজ্ঞতায় ও আঘাতে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান অধিকবয়সেও বাল্যকালের প্রাকৃতিক প্রীতি হইতে বঞ্চিত হয় না। সতীশচন্দ্রের বাল্যকালের প্রকৃতির অনুরাগ প্রাপ্তবয়সেও ছিল। আর শুধু তাই নয়, এই প্রীতির আলোকেই তিনি বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ লাভ করিতেছিলেন, আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এই আলোর শিখাতেই জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেন। অন্তর্জগতের স্বভাব এই যে, একই আলো এখানে বিভিন্ন ব্যক্তির চোখে বিভিন্ন দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডস্বার্থ দুই জনেই একই আলোতে জগৎ দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এক জগৎ-রূপ দেখেন নাই। সতীশচন্দ্রও সেই দীপ হাতেই জীবনতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে জগৎ-রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু সামান্য যে-কয়েকটি রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়, জগৎ-দর্শনের পথেই তিনি চলিয়াছিলেন—সে আভাস তাঁহার কবিতায় আছে। তাঁহার বাল্যের প্রকৃতির আকর্ষণ, যৌবনের প্রকৃতির

প্রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতির বৈচিত্র্য তাঁহাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও ভীতিরসে আপ্লুত করিয়াছিল—প্রকৃতির বৈচিত্র্য যে একটি অখণ্ড সত্যেরই প্রকাশ এ সত্যও তিনি বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বোধ কল্পনাগত হইয়া তাঁহার হাতে যে কাব্যবস্তু হইয়া ওঠে নাই তাহার একমাত্র কারণ, তিনি বয়সের সে ব্যাপ্তি পান নাই। তাঁহার কবিতা তাঁহার অলিখিত কাব্যের আভাস, তাঁহার জীবন তাঁহার অসমাপ্ত জীবনের আভাস। কাজেই তাঁহার জীবন ও কাব্যের আলোচনাও পরিপূর্ণ আলোচনার আভাস-মাত্র হইতে বাধ্য।

সতীশচন্দ্র বাল্যকালের প্রসঙ্গে ডায়ারিতে লিখিতেছেন—"ছেলেবেলায় 'আমাকে' স্পষ্টই ঐ দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমার কি ভাব ছিল। বৃষ্টির দিনে কে আমাকে ঘরে রাখিবে? ঝড়ের দিনে কত ভাল লাগিত! বর্ষা-বিদ্যুতের গর্জনে কি নিবিড় আনন্দে হৃদয় কাঁপিত। বাহিরই আমার প্রিয় ছিল।...আজও গ্রাম্য প্রকৃতিটি আমার বুকের মধ্যে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই দীঘি, সেই বটগাছ আমার কাছে দেবতার মতো বোধ হয়। স্মরণমাত্রেই হৃদয়ে এমনি একটি অপূর্ব আনন্দ এবং ঔদার্যের সঞ্চার হয় যে তাহা বলিতে পারি না।"

যে দুটি তন্তুর টানাপোড়েনে এই বালক-কবির জীবন বয়ন হইতেছিল তন্মধ্যে একটি প্রকৃতির প্রীতি, অপরটি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হইবার পূর্বেই রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে **"গুরুদেবের স্বর্ণময় কবিতার সহিত পরিচয় হয়। ...গুরুদেবের কবিতাই আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে**

ভাসিতে আজ উদয়াচলের ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতরে নামিয়া মধু-ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।"

তার পরে সতীশচন্দ্র প্রথম-যৌবনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া পড়িলেন। সেখানকার প্রকৃতিও তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পাইয়া বসিল।

শান্তিনিকেতনের আকাশপ্রসারিত মাঠের উপরে গ্রীষ্মকালের দুপুরে হঠাৎ যে ঝড় দেখা দেয়, ঝড়ের উত্তরপর্বে যে বৃষ্টি নামে, সতীশচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিতেছেন—"কাল আমরা খসখসের পর্দাঢাকা রথীন্দ্রের কক্ষে শুইয়া, বসিয়া, লুটিয়া, গরমে হেলাহেলি করিয়া দুপুর যাপন করিতেছিলাম।...হঠাৎ মাঠের উপর ছায়া পড়িতে লাগিল। পশ্চিম-উত্তর কোণা হইতে আকাশের উপরে বড় বড় মেঘ জলে ভারী হইয়া কালো হইয়া টলমল করিয়া আসিতে লাগিল। অল্প একটু একটু হাওয়া। হঠাৎ বাহির হইয়া দেখি দূরে হাওয়া উঠিয়াছে। আমরা মাঠে নামিয়া দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলাম। আঃ এই বিরাট মাঠের মধ্যে ধুলিরাশির হুহু করিয়া দৌড়াইয়া যাওয়ার দৃশ্যটি কি চমৎকার। ভেরীরবে আহূত যুদ্ধযাত্রী হাজার হাজার অশ্বারোহীর মত হোঃ হোঃ করিয়া ধূলিপটল ছুটিয়াছে। ক্রমে মেঘে ধুলায় মিলিয়া একটা ঘোর অন্ধকার হইয়া গেল। একটু দূরেই আর কিছু দেখিতে পাই না। যেদিক হইতে পবনদেব আক্রমণ করিতেছিলেন সেদিকে মুখ ফিরাইবে কাহার সাধ্য। অস্ত্রলেখা পৃষ্ঠেই লইতে হইল। তাও দাঁড়াইয়া থাকা মুস্কিল, এত ছিটাগুলি আসিয়া পিঠের উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন কাজেই হাওয়ার সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম। ভারি আনন্দের

আশায় সকলকে ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। এমন হাওয়ার মধ্যে পড়িলে গম্ভীর লোকদেরো পাগল হইতে হয়। ...যা হোক সেই রুদ্র ঝঞ্ঝার সঙ্গে মিলাইয়া যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে বার বার ওংকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলাম। ভারি চমৎকার লাগিল। ..ক্রমে ঝড় পড়িয়া আসিল—বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু বৃষ্টিও থামিয়া আসিতে লাগিল। আমি মাঠের বিচিত্র গেরুয়া রঙের জলপ্রবাহের মধ্য দিয়া ফিরিতে লাগিলাম। ভীষণ বেগে গেরুয়া জলে সাদা ফেনা তুলিয়া স্রোত নামিয়া যাইতেছে।...তখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া সব চুপ, আকাশ মেঘলা কোমল, মাঠ সিক্তচ্ছবি কিন্তু শুষ্কপ্রায়।”

শান্তিনিকেতনের মাঠে ঝড়বৃষ্টির এই অকস্মাৎ তাণ্ডব স্বচক্ষে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই এই বর্ণনার সম্যক রস পাইবেন। এখন সে মাঠ মানবহস্তরোপিত গাছপালায় শ্যামল হইয়া গিয়া ঝড়ের উদার আসরকে সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই ঝড়ের পূর্বরূপ দেখিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। সতীশচন্দ্রের ডায়ারির পাতায় সে দিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ। তাঁহার রচিত গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের কোন কোন স্থলে সে বর্ণনা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে প্রান্তর ও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের বর্ণনা, তাহা শান্তিনিকেতনের মধ্যাহ্নের অভিজ্ঞতারই রূপান্তর।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মূলে একটি অখণ্ড ঐক্য আছে এই উপলব্ধি ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্রের চিত্তে দেখা দিতেছিল। গুরুদক্ষিণা গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসাতলের বর্ণনাটি এই ঐক্যোপলব্ধির চিহ্ন। জগতের বৈচিত্র্যের মূল রসাতলে

নিহিত।—"রসাতলই সেই অতল রসের ভাণ্ডার যেখান হইতে রস টানিয়া এই সৌরজগৎ একটি গাছের মত বিকশিত হইয়া আছে।... এই জগতের উপরে আলোকে বিদ্যুতে বিকীর্ণ যে তেজ দেখিতেছ, সেও রসাতলের গোপন কক্ষে আপনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং পৃথিবীর উপরে যে বৎসরের অংশে অংশে ঋতুর বিচিত্র ছবি দেখিতেছ, ইহাও সেইখানকার একটি মূল ছবিরই প্রতিবিম্ব, এবং পৃথিবীর নিত্যনূতন দিবা রাত্রিও সেখানকার একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির লীলামাত্র। এই পৃথিবী, এই সূর্যমণ্ডল নানা ক্ষয় সত্ত্বেও যে প্রতিদিন সজীব রহিয়াছে, ঋষি-কবিগণ সেই সজীবতার মধ্যে যে ঐশী শক্তি দেখিতে পাইতেন তাহাকেই বলিতেন দেবতা অশ্বিনীকুমার। জগতের স্বাস্থ্যের তরুণ দেবতা যুগল অশ্বিনীকুমারও সেই রসাতলে তাঁহাদের তেজোময় সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।"

এই বর্ণনাটিও তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রূপান্তর। তাঁহার ডায়ারির এক স্থলে আছে—"এই বিরাট বোলপুরের মাঠ, রৌদ্রে অগ্নিতেজ বুঝাইয়া দেয়, সবিতার তেজ বুঝাইয়া দেয়, ঝড়ে বায়ুর শক্তি প্রকাশ করে, মেঘে বর্ষায় ইন্দ্রকে স্মরণ করায়, এবং অন্ধকারে চান্দ্রমসী ভাষা তারকী ভাষা লিখিয়া অশ্বিনীকুমারের রসভাবের অনুভূতি দান করে।"

এই অনুভূতি, এই কল্পনা কেবল সতীশচন্দ্রের বাল্যকালসুলভ কল্পনা নয়, জগতের বাল্যকালীন কল্পনা, বাল্যকালীন অনুভূতি, যে অনুভূতি ও কল্পনার ফলে প্রাচীন কালের পুরাণ ও উপকথার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। জগৎ হইতে এই রহস্যবোধ অন্তর্হিত হইয়াছে—এখন কেবল সৌভাগ্যবানেরাই মাঝে মাঝে ইহা অনুভব করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালে সমগ্র মানবসমাজ এই সৌভাগ্যের অধিকারী

ছিল। গুরুদক্ষিণার সপ্তম পরিচ্ছেদে রসাতলের যে বর্ণনা দেখিতে পাই, যে কবিকল্পনার সাক্ষাৎ লাভ করি বাংলা সাহিত্যে তাহা বিরল। কিন্তু তার সঙ্গে যখন মনে পড়ে যে, লেখকের বয়স একুশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখন বিস্ময়ের ও পরিতাপের অন্ত থাকে না— 'কি হইতে পারিত'র বিস্ময় 'কি হারাইলাম' এর পরিতাপকে নিরন্তর আন্দোলিত করিতে থাকে। নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনার বিশিষ্ট রূপটি সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র কি সচেতন ছিলেন? তাঁহার ডায়ারিতে দেখিতেছি—"কবিতা রচনার মত নিবিড় ব্যথা আমি কোনো দিন ধরিতে পারিব না? জানি না—কিন্তু আজ অন্ততঃ এটা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে ভবিষ্যতের সাহিত্যের মধ্য দিয়া শান্ত সুন্দর গদ্যধারা বহিয়া যাইতেছে, উহাই আমার। ঐ ধারা কল্পনা সৌন্দর্য এবং বিলাসের আক্রমে একটা বড় এবং বিচিত্র কিন্তু নিবিড় বেদনায় সুগভীর না হইতেও পারে। আমার চিত্তক্ষেত্রে বিচরণশীল এই তেজস্বী কল্পনামূর্তিগুলি কবে বাহির হইবে? আমি essentially Indian—ভারতের রস আমার প্রাণে বসিয়াছে।"

সতীশচন্দ্রের ডায়ারির স্থানে স্থানে যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ আছে, তাহা কবিকিশোর কীট্‌সের পত্রাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সতীশচন্দ্র 'essentially Indian' যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রসাতলের বর্ণনাই তাহার প্রমাণ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক রসের জন্মগত অধিকার না লইয়া আসিলে কাহারো পক্ষে এমন রচনা সম্ভবপর হইত না। কীট্‌স-ও essentially গ্রীক ছিলেন, গ্রীকদের সৌন্দর্যদর্শনের তৃতীয় দৃষ্টি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে 'শান্ত সুন্দর গদ্যধারা'র উল্লেখ সতীশচন্দ্র করিয়াছেন তাঁহার ডায়ারিতে, গুরুদক্ষিণায় এবং কোন কোন গদ্য-রচনায় তাহা

প্রবাহিত। এই সরস্বতীপ্রবাহ অকালে বালুকান্তরে অন্তর্ধান করিয়াছে বটে, কিন্তু কান পাতিয়া থাকিলে রচনার মধ্যে এখনো তাহার তরল বেণীবিন্যাসের অনির্বচনীয় স্বগত বিলাপ নিঃসন্দেহে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

৪

সতীশচন্দ্র 'আরো একটি কথা' (One Word More by Robert Browning) প্রবন্ধে বলিতেছেন—"যদি পুনর্জন্ম মানিতে হয় এবং বিশ্ব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এরূপ যদি বিশ্বাস করি, তবে শেলি ব্রাউনিংরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিতে পারি না কি?" তিনি বলিতেছেন, শেলির মৃত্যুর এবং ব্রাউনিঙের জন্মের তারিখ দুইটি বিস্মৃত হইতে পারিলে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। সতীশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিবার কারণ নাই। যেহেতু ব্রাউনিং ও শেলির কাব্যে গুণগত, মূলগত প্রভেদ—সে প্রভেদ জন্মান্তরেও ঘুচিবে এমন আশা নাই। তবে ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, কিশোরকবির চিত্তে ব্রাউনিং ও শেলি দুইজনেই প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। ব্রাউনিঙের কাব্যপাঠে যে তাঁহার নেশা ছিল এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। ব্রাউনিং সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রাউনিঙের গোটা তিনেক কবিতার সুষ্ঠু অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, তাঁহার কাব্যে ব্রাউনিঙের প্রভাব নাই—যাহা-কিছু প্রভাব দৃষ্ট হয় সে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্ত রচনায়। অর্থাৎ ব্রাউনিঙের প্রভাব তাঁহার

সজ্ঞান মনে প্রতিক্রিয়া শুরু করিয়াছিল, কিন্তু যে নিগূঢ় সত্তা হইতে কাব্যসৃষ্টি হয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সতীশচন্দ্রের কাব্যের অধিপতি শেলি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে সবচেয়ে প্রকট। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহার কাব্য নিগূঢ় দৃষ্টিতে পাঠ করিলে একটা প্রভাবান্তরের আভাস পাওয়া যায়। শেলির প্রভাব হইতে কীট্‌সের প্রভাবে তাঁহার কাব্যের সংক্রমণ হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার কাব্য-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলে দাঁড়ায় এইরকম যে, শেলির পূর্ণ প্রভাব তাঁহার কাব্যে বর্তমান, তাঁহার কাব্যের ভবিষ্যৎ কীট্‌সীয় মনোভাবের অভিমুখে, ব্রাউনিঙের যাহা-কিছু সে প্রভাব তাঁহার সজ্ঞান মনের উপরে মাত্র, কাব্যলোকে তিনি প্রবেশ করেন নাই।

শেলি ও কীট্‌স দুইটি বিশেষ মনোভাবের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক শেলির প্রতীক, আর কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল কীট্‌সের প্রতীক। শেলির স্কাইলার্ক 'অশরীরী আনন্দ'—পৃথিবীর সংস্পর্শ মুক্ত হইয়া আলোকপ্লাবিত অনন্ত আকাশে উঠিয়া তবে যেন সে আত্মস্থ হয়। আর কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল গূঢ়ান্ধকার বনচ্ছায়ায় বসিয়া কূজন করিতে ভালবাসে। একটি পৃথিবী-বিবিক্ত আত্ম-চেতন, অপরটি পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট জগৎ-চেতন, একটি আত্মকেন্দ্রিক, অপরটি জগৎ-কেন্দ্রিক, একটি pure intellect, অপরটি pure sensation; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, অপরটি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবজীবনের প্রতি আসক্তি, একজন নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিক, আর একজন সোনার তরীর মাঝি। ব্রাউনিং এ-দুইয়ের কোনটিরই সগোত্র নহেন। শেলি যদি হন

দেহবিমুক্ত intellect-এর কবি, কীট্‌স যদি দেহকেন্দ্রিক sensation-এর কবি, ব্রাউনিং তবে মানুষের moral values-এর কবি। তাঁহার চিত্রিত অধিকাংশ নরনারীর দ্বন্দ্ব আপনার অন্তরের শুভাশুভবুদ্ধির মধ্যে। Intellect বা sensation যতক্ষণ না moral values-এর কোঠায় আসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ ব্রাউনিঙের কাছে ও-ছুটি বস্তু নিরর্থক। তাঁহার কাব্যজগতের সুমেরু কুমেরু 'Good' ও 'Evil' এবং ইহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলেই জগতে বৈচিত্র্য বিরাজমান —ব্রাউনিং সেই বৈচিত্র্যের কবি। শেলি যে পুনর্জন্মে ব্রাউনিং হইতেন তাহা বিশ্বাস করি কি প্রকারে? বরঞ্চ জন্মান্তরবাদ মানিতে হইলে বলিতে হয়, শেলি পূর্বজন্মে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি Evil-এর মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কাছে Evil নাই, কারণ যে জগৎটার অস্তিত্বের উপরে Evil-এর প্রতিষ্ঠা, সেই জগৎটাই যে মায়া। কেবল আছে—

"The one remains, the many change and pass ;
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly."

Hymn to Intellectual Beauty-র কবি কোন বহুপূর্বজন্মে সংস্কৃত কাব্য আনন্দলহরী লিখিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন পরজন্মে ব্রাউনিঙের কাব্য লিখিবেন, এমন বিশ্বাস পোষণ করা কঠিন।[১]

কীট্‌সের কবি-মন এই ছুই হইতেই ভিন্ন। তরুণ শেক্সপীয়রের মনের সঙ্গে কীট্‌সের মনের সারূপ্য আছে—এ সত্য ইংরাজ সমালোচক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কবিদের মধ্যে

১ আনন্দলহরীর সহিত Hymn to Intellectual Beauty-র তুলনা রবীন্দ্রনাথ-কৃত।

কালিদাসের কবি-মন মূলতঃ কীট্‌স-শেক্সপীয়রের কবি-মনের শ্রেণীভুক্ত। ইহারা তিনজনেই যে সমান ওজনের কবি এমন কথা বলিতেছি না, কেবল তিনটি মন একই পর্যায়ভুক্ত, ইহাই মাত্র বক্তব্য।

সতীশচন্দ্রের কবি-মন খুব সম্ভবত এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে পর্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইবার পূর্বেই, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিবার পূর্বেই, তাঁহার কবিজীবন শেষ হইয়াছে। যেকবি-কৃতি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শেলির প্রভাব জাজ্বল্যমান। কিন্তু মাঝে মাঝে কখনো কখনো শেলির জ্যোতিরুদ্দীপ্ত মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে যে-জগতের দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা কীট্‌সের জগৎ। জীবনের অভিজ্ঞতার ভার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবি মেঘলোক হইতে যে জগতে নামিয়া আসিতেন তাহা কীট্‌সের সুখদুঃখবিরহমিলন-বিচিত্র ঐকান্তিক মানবসংসারের জগৎ। এমন আভাস তাঁহার রচনায় আছে বটে, কিন্তু তাহা যেমন ভাবে অনুভবগম্য তেমন ভাবে প্রমাণযোগ্য নহে। যদি কেহ বলেন যে আমি বিশ্বাস করিলাম না, তবে হার মানিতে হইবে, কারণ কাব্যবিচারে অনেক সময়েই 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ'র উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু অপর সত্যটা অনায়াসে বিশ্বাসগম্য করিয়া তোলা যাইতে পারে—সেটা শেলির প্রভাব।

সতীশচন্দ্রের "শেলির প্রতি" কবিতাটি শেলির Alastor ও Epipsychidion ভাঙিয়া এবং নিজের বৈশিষ্ট্য মিশাইয়া প্রস্তুত। কবিতাটিতে শেলি ও সতীশচন্দ্র দুজনেই আছেন। শেলির কাব্যের মর্ম আত্মসাৎ না করিলে সতীশচন্দ্র কখনো "রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এসব তো

কেবল বস্তুগত প্রভাব, গৌণ। কিন্তু আর একটি মুখ্য প্রভাব আছে, কিংবা তাহাকে স্বভাব বলাই উচিত। শেলি ও সতীশচন্দ্রের রচনার আবহাওয়াটির ভাব একই প্রকার—দুই-ই মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে ভাস্বর।

শেলির কাব্যলোকের অম্বর ইটালীয় মধ্যাহ্নের কিরণপ্লাবে সর্বদাই যেন দেখা-না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে। একটা প্রখর 'ইন্‌টেলেক্ট'-এর ধারায় সমস্ত জগৎ অভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে যেন অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই দেখিয়াই শেলির নিগূঢ় কবিমানস যেন তাহার উপরে বিশুদ্ধ চৈতন্য সিঞ্চন করিয়া দিয়া তাহাকে খানিকটা লঘু, খানিকটা অবাস্তব করিয়া লইয়াছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর শোধন। শেলির জগৎ বুদ্ধিশোধিত জগৎ। এই শোধন তাঁহার সজ্ঞান মন করিত না। কবি-মন শেলির অগোচরে করিত। তাঁহার কাব্যের অবিরল মধ্যাহ্নের আবহাওয়া এই বিশুদ্ধ 'ইন্‌টেলেক্ট'-এর প্রতীক।

"Blue isles and snowy mountains wear
The purple noon's transparent might."

এই purple noon-এর রৌদ্র কেবল পার্থিব নয়, তাহার সহিত কবির আত্মার কিরণ মিশিয়া তাহাকে একপ্রকার অপার্থিবতা দান করিয়াছে। এই অপার্থিবতা শেলির কাব্যের ধর্ম।

শেলির কাব্যের এই ধর্মটি সতীশচন্দ্রের কাব্যেও বিরাজমান।

সতীশচন্দ্রের কাব্য পড়িতে গেলে নিতান্ত অন্ধ ব্যক্তিও অনুভব করিবে, একটা মধ্যাহ্ন-কিরণ-প্লাবিত ভূখণ্ডে যেন সে বিচরণ করিতেছে। এই কিরণধারা কবির মন হইতে উৎসৃষ্ট হইয়া

পাঠকের মনে আসিয়া প্রবেশ করে। এই কিরণ কবির আত্মার কিরণ, একপ্রকার অপার্থিব জ্যোতি—ইহা pure intellect-এর বাহ্য প্রকাশ।

"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি", "শেলির প্রতি", এই দুটি কবিতাই মধ্যাহ্ন-রসে নিটোল।

একি এ ভুবনময় মহিমা রবির
কিরণ নীরব একি গগন গভীর। —"মধ্যাহ্নে"

এ স্বপন সারাদিন ধ'রে!
সোনার আলোকময় ঘরে··· —"স্বপ্ন, সম্মুখের"

দুপরের বেলা গালে হাত দিয়ে
জননী একাকী ভাবিছে বসিয়ে!
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ
কি রসের স্রোত··· —"পরীর জন্মকথা"

ডুবিয়া আছে তরী—
কিরণময় সুনীল নভ-সাগর মাঝে পড়ি
ডুবিয়া আছে তরী! —"দিবাভাগে চাঁদ"

"দিবাভাগে চাঁদ" একটি আশ্চর্য রকমের কবিতা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, চাঁদের মত অন্ধকারসম্বন্ধ বস্তুকেও দুপুরের রোদে না দেখিয়া কবির তৃপ্তি নাই।

"আগ্রাপ্রান্তরে" আর একটি সার্থক সৃষ্টি। এ কবিতাটির আবহাওয়া দ্বৈপ্রহরিক।

গুরুদক্ষিণা গ্রন্থে ও তাঁহার ডায়ারির পাতা ক'খানিতে যে-কয়েকটি প্রাকৃতিক চিত্র আছে তন্মধ্যে দ্বিপ্রহরের বর্ণনাই বোধ করি সবচেয়ে অধিক এবং সেইগুলিই রচনারসে অনবদ্য।

এ কি কেবলই একটা কাকতালীয় ব্যাপার, না, গূঢ় কারণ কিছু আছে? শেলির কাব্যধর্ম আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম এক্ষেত্রেও তাহাই বক্তব্য। শেলির কবিধর্ম ও সতীশচন্দ্রের কবিধর্ম মূলতঃ ভিন্ন হইলেও এই সময়টাতে তিনি দূরগগনের একটি গ্রহের মত শেলির জ্যোতির্লোক অতিক্রম করিতেছিলেন, শেলির জ্যোতির্ময় বাষ্প সতীশচন্দ্রের নভোমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাই তাঁহার কাব্য এমন মধ্যাহ্নকিরণ-দীপিত, তাই এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা তাহার। কিন্তু সংক্রমণ পরিক্রমণমাত্র, জীবিত থাকিলে শেলির কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইতেন এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। সে স্বধর্ম কীট্‌সীয় ধর্ম। তাই এই জ্যোতির্ময় মেঘলোকের ফাটলপথে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা কীট্‌সের জগতের। দূরাপহত ক্ষীণ দৃশ্য—কিন্তু সেই দিকেই তাঁহার উদ্দিষ্ট গতি।

সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন—
সরস কৈশোরসম। —"আজি"

বৃহৎ সে প্রাণ
ধরণীর ঔদার্যের যেন এক দান
বিপুল বটের মতো। —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

ধরণী-গগনে লাগে মধুরস-জোয়ারের টান! —"নিশীথিনী"

দলমল স্বর্ণগাঁদা —"আত্মসমর্পণ"

সৌন্দর্যই শূরত্বের মৃত্যুগীত গায়। —"আগ্রাপ্রান্তরে"

এই কয়টি ছত্রে ভাষার যে প্রৌঢ়তা, যে নিটোল কঠিন মূর্তি, কল্পনার যে ঘনপিনদ্ধ বস্তুগত দৃঢ়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা

একান্তভাবে কীট্‌সীয়, একান্তভাবে কালিদাসীয়, আর পূর্বেই বলিয়াছি যে কালিদাস ও কীট্‌সের মন এক পর্যায়ভুক্ত। আমার কেমন যেন বিশ্বাস, সতীশচন্দ্রের মনও সেই পর্যায়ভুক্ত; পূর্বোক্তদের কল্পনার মাত্রাগত যতই তারতম্য থাকুক-না কেন, গুণগত ভাবে তাহারা একজাতিক। এই স্বভাবের দিকে তাঁহার কল্পনা চলিতেছিল, এমন সময়ে অকালমৃত্যু আসিয়া ছেদ টানিয়া দিল।

৫

অভিধানে হাজার হাজার শব্দ আছে, ইঁটের পাঁজায় হাজার হাজার ইষ্টকখণ্ডের মতই সে সমস্তই নির্জীব ও নিরর্থক। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকগণ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। মাইকেল মধুসূদন এমনতর বহু শব্দকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে বহুতর শব্দ প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। শব্দ-ব্যবহারের সহজাত ক্ষমতা লইয়াই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক আসিয়া থাকেন। এই ক্ষমতাতেই সাহিত্যিকের চরম বৈশিষ্ট্য। দময়ন্তী নল-বাহুল্যের মধ্যে আসল মানুষটিকে চিনিতে পারিয়াছিল, কারণ তাহার ছিল প্রেমের দৃষ্টি। সাহিত্যিকদেরও শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টি থাকে, না থাকিলে সে সাহিত্যিকই নয়। শব্দের প্রতি এই প্রেমের দৃষ্টির কীট্‌স বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের এই দৃষ্টি প্রভূত পরিমাণে ছিল।

শিক্ষিত বাঙালী কবির পক্ষে তৎসম শব্দ প্রয়োগ খুব কঠিন নয়, তার চেয়ে অনেক কঠিন দেশী ও তদ্ভব শব্দ প্রয়োগ;

এখানেই তাঁহার মুনশীয়ানা বা দুর্বলতা ধরা পড়ে। সতীশচন্দ্রের রচনা হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার এই শ্রেণীর শব্দ-ব্যবহারের কলাকৌশল বুঝিতে পারা যাইবে—

সমুদ্রে নৌকার বর্ণনা—

হুস্ করি' নেমে পড়ে বারিরাজ্যমাঝে,
জল উঠি' উচ্ছ্বসিয়া চারি ধারে নাচে,
ডুবায় উপুড় করি', কাৎ করি তরী, —"রৌদ্রমুগ্ধ কবির চিঠি"

"ভগ্ন বাড়ির দেবতা"য়—

চুপ চুপ চুপ, নীরবে নীরবে—
আয় তোরা সরে, যা তোরা সবে—
সোনার ফড়িং সোনা মক্ষিকা ;
উত্তর দখিন পূবের দালান
এখনও ঘুমে অন্ধ নয়ান
শুধু পশ্চিমে ধব্‌ধবে জ্যোতি
পট তুলি' দিয়া জাগে সম্প্রতি।

ভগ্ন বাড়ির দেবতা বলিতেছেন—

চুপ চুপ চুপ নাহি গোলমাল
বড় সুখে আছি, এ দীর্ঘকাল।
হাতী ধপধপি, ঘোড়া খটমটি'
দরোয়ান যত বকি' কট্‌মটি···
আর উঠে নাকো সকালবেলায়
আছি সুখে আমি আপন খেলায়।

আর একটি কবিতায়—

বিহঙ্গম মুহুঃ উড়ে শীস থামাইয়া।

আবার—

শুধু কভু মেঘচ্ছেদে স্ফুট চন্দ্রকর—
মাঝে মাঝে দীপ্ দীপ্ জোনাকিপ্রকর—"স্বপ্ন, পশ্চাতের"

"দুঃখ-দেবতার মূর্তি" নামে কবিতায়—

পশ্চিম দিগন্তে যেথা গভীর সিঁদুর
যেন কোন উপন্যাস-রাজার মহাল-মালা
ভাঙিয়া পড়েছে চুর চুর।

"জামদগ্ন্য" কবিতায়—

পত্ পত্ চীনাম্বরে রথাগ্রচূড়ায়—
হাজার কপোতী যেন উড়িয়া বেড়ায়।

"আত্মসমর্পণ" কবিতায় গাঁদার বর্ণনা—

দলমল স্বর্ণগাঁদা।

প্রতিভার লক্ষণ এই যে শব্দপ্রয়োগে যুগপৎ সাহস ও সংযম প্রকট হয়। অক্ষমে দুঃসাহস ও বাহবা কুড়াইবার দুর্বুদ্ধি আর যাই হোক প্রতিভার পরিচয় নয়। ইহা কাঁচাবয়সের লক্ষণ। সতীশচন্দ্র কাঁচাবয়সেই এইসব কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভার সহজাত সাহস ও সংযম তাঁহাকে শিল্পীর পথে চালিত করিয়াছিল। তিনি নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু কোথায়, কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে সে-সব প্রয়োগ করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহার কোন মোহ ছিল না।

সতীশচন্দ্রের কবিতার পরিচয়দান বাহুল্য, কারণ তাঁহার রচনার পরিমাণ বহুল নয়। গদ্য পদ্য সমস্তই প্রায় একাসনে পড়িয়া ফেলা যায়। কিন্তু পাঠকসমাজের কাছে তাঁহার রচনা

অজ্ঞাত কেন? একটা কারণ এই যে, সতীশচন্দ্রের রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকসমাজ সত্যকার রসপিপাসু হইলে তাহা তো হইবার কথা নয়। আবার যখন শুনি যে বাংলা পাঠকমহলে কবিতার প্রচার বাঁড়িয়াছে, তখন বিস্মিত হই। রসতৃষ্ণা সত্যই তীব্র হইলে রসিক পাঠক তাঁহার কবিতা আবিষ্কার করিয়া লইত। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবিতা-পত্র সম্পাদিত হইতেছে, তবে সতীশচন্দ্রের কবিতার এই অজ্ঞাতবাস কেন? আসল কথা রাজনীতির মত বাংলা সাহিত্যের ঘাড়েও দলবুদ্ধির ভূত ভর করিয়াছে। সতীশচন্দ্রের বিস্মৃতির প্রধান কারণ, তিনি কোন দলভুক্ত হইয়া মারা যান নাই। তবে "Leaving great verses to a little clan" যদি সান্ত্বনার বিষয় হয়, তবে সতীশচন্দ্রের আত্মা কতকটা সান্ত্বনা পাইতে পারেন।

৬

সতীশচন্দ্রের গদ্যরচনা সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করিয়াছি। আর দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার লিখিত 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' ও 'ক্ষণিকা'র আলোচনা অদ্যাবধি এই দুইখানি কাব্যের শ্রেষ্ঠ রসালোচনা হইয়া আছে। আর তাঁহার ডায়ারির একস্থানে তিনি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বে এই দুই মহাকবির মধ্যে আর কেহ তুলনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথের সহিত ভারতীয় কোন কবির যদি সার্থক তুলনা চলে তবে নিশ্চয়ই তাহা কালিদাসের। অল্পবয়সে সার্থক কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু সমালোচকের

অন্তর্দৃষ্টি একান্ত বিরল। কীট্‌সের চিঠিপত্রে এইরূপ অন্তর্দৃষ্টির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

সতীশচন্দ্রের রচনার বিস্তারিত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার রচনার প্রতি বাঙালী পাঠকসমাজের মনোযোগ আকর্ষণই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। বাল্যকালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম তখনও সেখানকার অনেকের মনে পরলোকগত কবির স্মৃতি নবীন ছিল। সেই স্মৃতিকণার অনেক বিষয় আমার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থ আমার বালকচিত্তে যে মোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। এই প্রবন্ধ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনের সেই তরুণ অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের একটা সন্তোষজনক সুযোগ পাইলাম। পাঠকের কোন লাভ হইল কিনা জানি না কিন্তু ঐ সন্তোষটাই আমার লাভ।

কবি চতুষ্টয়

কোন কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক দল কবি অতি সহজে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া একটি বিশিষ্ট কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করে। সে-সব দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এইসব গোষ্ঠীপ্রেরণার ইতিহাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসী সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন, 'লাটিন জিনিয়াস' নামে জাতিচরিত্রের ফলেই ফরাসী দেশের সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গৌণ গুণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও 'লাটিন জিনিয়াসে'র দৃঢ়বন্ধনে কবিদের গোষ্ঠী বাঁধিতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠীর সমস্ত লেখক সমানভাবে একই গুণের অধিকারী নয়, তেমন হইলে তো একজন অপরের হুবহু অনুরূপ মাত্র হইত; বক্তব্য এই যে, মূল বন্ধনে একীভূত হইয়াও এক একজন এক একদিকের দিক্‌পাল। মূল গুণ 'লাটিন জিনিয়াসে'র সমীকরণ বন্ধন, গৌণ গুণ কবির নিজস্ব শক্তি। ফুলের তোড়ায় বিচিত্র ফুল, বন্ধনে তাহারা একীভূত।

ফরাসী সাহিত্য যদি ফুলের তোড়ার ইতিহাস হয়, ইংরাজী সাহিত্য আল্‌গা ফুলের ইতিহাস, সেখানকার বাগিচার ফুল সহজে তোড়ার বন্ধন স্বীকার করিতে চায় না। কখনো কখনো ইংলণ্ডের সাহিত্যে ফুল তোড়া বাঁধিয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু দু' চারদিন পরেই দেখা গিয়াছে যে মানসিক আবহাওয়া অনুকূল নয়। বন্ধন যত আগ্রহে স্বীকার করিয়াছিল, বন্ধনমুক্তির আগ্রহ তার চেয়ে

অনেক বেশী তীব্র। যৌবনে ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ ও সাউদে মিলিয়া একটি গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু শেষে দেখা গেল, ব্যাপারটা স্বপ্নের চেয়ে বেশী স্থায়ী নয়। পরবর্তীকালে রসেটি, সুইনবার্ন প্রভৃতি 'প্রিরাফেলাইট ব্রাদারহুড' নামে একটি গোষ্ঠী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, কার্যত বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস গোষ্ঠীভঙ্গের ইতিহাস। এমন যে হয় তার কারণ ইংরাজের জাতিচরিত্রের ঝোঁকটা স্বভাবতই ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের দিকে। কোন মূল বন্ধনে তাহাদের এক করিয়া রাখে নাই বলিয়াই গৌণ প্রেরণায় তাহাদের পক্ষে এক হওয়া কঠিন। এই জাতিচরিত্রের বিকাশ ইংরাজ ইতিহাসের সর্বত্র। নৌযুদ্ধে ইংরাজের অসামান্যতা ও স্থলযুদ্ধে ন্যূনতার মূলেও এই গুণ। বাষ্পশক্তি ও বেতারের আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত মহাসমুদ্রে প্রত্যেকখানি যুদ্ধজাহাজ ছিল স্ব স্ব প্রধান, জাতিচরিত্রের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যতৃষ্ণা সহজে সিদ্ধির পথ পাইত। স্থলযুদ্ধে ঘনীভূত সেনাবাহিনী সেনাপতির চোখের সম্মুখে, হাতের কাছে থাকে, সেখানে স্ব স্ব প্রাধান্যের সিদ্ধিপথ বন্ধ। ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, দুই দেশের জাতিচরিত্রের ভিন্নমুখী ঝোঁক। ফরাসী রোমান্টিক পর্বের লেখকগণ যেন একটা ছক্ কাটিয়া লইয়া লিখিতে বসিয়াছেন, ইংরাজী তৎপূর্বের লেখকগণ সজ্ঞানে অজ্ঞানে কোন বন্ধন মানিতে রাজী হন নাই। তবে যেটুকু মিল দেখা যায়, সে যুগের হাওয়ায়; যুগের হাওয়ায় মিল, দেশের আবহাওয়ায় অমিল।

এখন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কি? এদেশের ঝোঁকটা কোন্

দিকে ? মৌল গুণে আবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠী বাঁধিয়া উঠিবার দিকে না স্ব স্ব পথে স্বতন্ত্রভাবে চলিবার দিকে ? বাঙালী জাতিচরিত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকটা স্বাতন্ত্র্যের দিকে, মিলিত সিদ্ধির পথ তাহার নয়। এইজন্যেই বাঙালীর জাতিচরিত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাহিত্যে, সাহিত্য দশের কাজ নয়; সাহিত্যের মধ্যেও আবার লিরিক, লিরিকে এককের সিদ্ধি।

মধ্যযুগে একবার চৈতন্যদেবের দিব্যপ্রভাবের সূত্র পদাবলী কবিগণকে কিছুকালের জন্য বাঁধিয়া এক প্রেরণায় তন্ময় করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছিলেন এমন বলা চলে না।

একালে ব্যক্তিবিশেষ বা সাময়িকপত্র-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া কখনো কখনো একদল লেখক ঘনীভূত হইয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, রবীন্দ্রনাথ ও সাধনা, সমাজপতি ও সাহিত্য প্রভৃতি উদাহরণ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মিলটা নিতান্তই আকস্মিক, তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আর দশজনের চেয়ে এত বড় যে গোষ্ঠী-চালনার দায়িত্ব গ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ও বস্তু বাংলার ধাতে নাই, পরিকল্পনা ফাঁদিয়া সাহিত্যরচনায় বাঙালীর অনাগ্রহ। জাতিচরিত্র-সিদ্ধ যাহা নয় তাহা করিতে গেলেও সাফল্য লাভ ক্বচিৎ ঘটে। আজ এখানে যে কয়জন বিশিষ্ট কবির প্রসঙ্গ তুলিতেছি তাঁহারাও গোষ্ঠীবদ্ধ এমন দাবি করি না। ব্যক্তিগত ও আদর্শগত মিলেই গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে। এ চারজনের মধ্যে সেরূপ দ্বৈত মিল নাই বটে, কিন্তু যে দেশের গোষ্ঠীবদ্ধতা সাহিত্যধর্ম নয়, সে দেশের পক্ষে তাঁহাদের ইতিহাস এক অভিনব দৃষ্টান্ত। সেইজন্যও বটে আর তাঁহাদের সমাপ্তপ্রায় কাব্যজীবনের সাফল্যের খাতিরেও

বটে—তাঁহারা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবেন।

২

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আবির্ভূত রবীন্দ্রানুগামী কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অনেকে এই সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নামটিও করিয়া থাকেন। যতীন্দ্রনাথ বয়সে ইঁহাদের তুল্য হইলেও অন্যান্য কারণে এই গোষ্ঠীভুক্ত নন। অন্য কারণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার পূর্বোক্তদেব চেয়ে ভিন্ন। আর তাহারই ফলে যতীন্দ্রনাথের কাব্যরূপ ইহাদের কাব্যরূপ হইতে ভিন্ন। আগেই বলিয়াছি যে, গোষ্ঠীবন্ধনে দুটি বাঁধনের আবশ্যক, একটি ব্যক্তিগত, অপরটি আদর্শগত। যতীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতায় ইঁহাদের গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও আদর্শের বিচারে স্বতন্ত্র। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা যতীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা করিব না। তাছাড়া, যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান্। তাঁহার কাব্য যেমন উত্তরপুরুষের রসানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে, তেমনি আবার প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে আলোচনার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। অন্য চারজন সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। দু' একটি প্রবন্ধ ছাড়া ইঁহাদের কাব্যের আদৌ আলোচনা হয় নাই। পাঠ্যপুস্তকের উদার সহযোগিতার ফলেই ইঁহাদের কবিতা পাঠকের অবজ্ঞা-সমুদ্রে কোনরকমে মাথা জাগাইয়া আছে। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়, এমন ঘটা উচিত নয়। অবশ্য অনেকে বলিতে

পারেন যে পাঠকসমাজে তাঁহাদের কবিশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন হইলে করুণানিধান ও কালিদাস রায় জগত্তারিণী পদক দ্বারা সম্মানিত হইতেন না। একথা সত্য যে, করুণানিধান ও কালিদাস রায় জগত্তারিণী পদক লাভ করিয়াছেন আর আশা করিতেছি যে অচিরকাল মধ্যে কুমুদরঞ্জন অনুরূপ উপায়ে অভিনন্দিত হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পদক পুরস্কারাদি অনেক সময়েই গতানুগতিক চালে চলে, তাহাদের চলনে বলনে বিশেষার্থ বড় থাকে না; ওসব বস্তু অনেক সময়েই অপঠিত গ্রন্থের প্রতি অশ্রদ্ধার মুষ্টিভিক্ষা।

অথচ কবিচতুষ্টয়ের কাব্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রভূত সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার যোগ্য উপাদানের অভাব নাই। আলোচনার এ একটি কারণ। অপর কারণ, তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য হারায় নাই; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যখন ক্রান্তিপাত ঘটিতেছিল তখন ইঁহারা ও ইঁহাদের মত কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্য সংস্কারটিকে সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে আজ যে ব্যবধান ইঁহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই। কেবল এই কারণেই তাঁহাদের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এইসব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে। উচ্চাঙ্গ

কাব্যরস বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্যপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই ; কিন্তু রবাহূত, অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্নে ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও অন্নের জাতিভেদ ছিল না। সেকাল কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে ; সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিঃপ্রাঙ্গণের আয়তনও বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে ? একশ বছর আগে মধুসূদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস-বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে। এমন যদি কখনও হয় যে, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদের সাকুল্যই খাসমহলের ভোগে লাগিয়া যাইবে, আর প্রবেশানধিকারীর দল ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক মুখে—তবে সেই সরস্বতীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩

যতীন্দ্রমোহন বাগচি নদীয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে কবিখ্যাতি লাভ করেন। বি-এ পাশ করিবার পরে মানসী, যমুনা প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনার সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। ঐ সময় হইতেই তিনি কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রেখা, লেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, নীহারিকা, মহাভারতী প্রভৃতি তাঁহার প্রধান কাব্যগ্রন্থ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ সালে নদীয়া জেলায় শান্তিপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কাব্যরচনারও সূত্রপাত কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগে। তিনি বি-এ পাশ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত জীবিকাসূত্রে জড়িত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাত্র কয়েক বৎসর আগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

১৮৮২ সালে বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম। দীর্ঘকাল মাথরুন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন থাকিয়া অনেক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কবি চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র কুমুদরঞ্জনই স্থায়িভাবে গ্রামের বাসিন্দা। কলিকাতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নৈমিত্তিক মাত্র। অজয়, উজানী, একতারা, বনতুলসী, বনমল্লিকা প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের জন্ম ১৮৮৯ সালে, বর্ধমান জেলার

এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশে। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচনদাস ইঁহার পূর্বপুরুষ। কলেজে পড়িবার সময়েই কালিদাসবাবুর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে তিনি বি-এ পাশ করিয়া রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে দীর্ঘকাল প্রধানশিক্ষকতার কার্য করেন। কিন্তু সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তিনি কলিকাতার অধিবাসী। অনেকদিন শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্প্রতি অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ঋতুমঙ্গল, রসকদম্ব প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

৪

এই সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্রগুলি কবিদের কাব্য বুঝিতে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করি; তাঁহাদের সৃষ্টিপ্রেরণার রহস্য বহুল পরিমাণে তাঁহাদের জন্মস্থান, পল্লীপরিবেশ, পরবর্তীকালে নাগরিক জীবনযাপন প্রভৃতি তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধানের জন্ম নদীয়া জেলায়, আবার কালিদাস রায় ও কুমুদ মল্লিকের জন্মস্থান বর্ধমান জেলা। তাঁহারা সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আর যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান ও কালিদাস রায় জীবনের অধিকাংশ কাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই কবিপ্রভাবের মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—যদিচ এ বিষয়ে কমবেশি আছে, যেমন কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব ন্যূনতম। রবীন্দ্রপ্রভাবের পরেই বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কুমুদরঞ্জনে ও কালিদাস রায়ে এ প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হইয়াছে, যতীন্দ্রমোহনের ক্ষেত্রে তাহার

প্রভাব স্বল্পতম। কিন্তু এই চারজনের উপরেই পল্লীপরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে ফলপ্রসূ হইয়াছে। কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসিবার আগে সেই যে এক সময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন সেই স্মৃতি মানসপ্রতিমা গড়িতে তাঁহাদের প্রভূততম সাহায্য করিয়াছে। করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহন মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন, কালিদাস রায় এখনো আছেন, কুমুদরঞ্জন তো কায়মনোবাক্যে এখনো পল্লীবাস করিতেছেন। আধুনিক কবিগণেব জীবনতন্ত্রে নগর একটি প্রধান উপাদান, সেইজন্য তাঁহাদের কাব্য জটিল ও অনেকাংশে দুর্বোধ্য (নাগরিক জীবনের রহস্যও যে জটিল ও দুর্বোধ্য)। পল্লীপরিবেশের উৎস হইতে প্রভাবিত বলিয়া ইঁহাদের কাব্য সরল ও প্রাঞ্জল। সরলতা ও প্রাঞ্জলতা এ যুগের কাব্যলক্ষণ নয় বলিয়া যুগপ্রেমিক পাঠক-গণের কাছে, যুগপ্রেমিক সমালোচকগণের কাছে ইঁহাদের কাব্য অনাদৃত। কিন্তু যুগপ্রেমকে অতিক্রম করিয়া রসভোগ করিতে সমর্থ হইলে ইঁহাদের কাব্যে উপভোগেব বস্তু যথেষ্ট পাওয়া যাইবে নিঃসন্দেহে। ইঁহাদের কাব্যেব যথেষ্ট সমাদরের অভাবের আর একটি কারণ—সাধারণভাবে ইঁহাদের কাব্যে প্রেমরসের স্বল্পতা। দাম্পত্যসম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম বিকশিত হয় তাহার বিকাশ ও লীলা ইঁহাদের কাব্যে যথেষ্ট আছে—এদিকে ইঁহারা অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্র সেনের অনুগামী; কিন্তু যে-প্রেম সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে না, আপনি আপনার নিয়ম রচনা করিয়া নরনারীর জীবনে ইন্দ্রজাল বয়ন করিয়া বেড়ায়, সে প্রেমের অভাব এইসব কবির কাব্যে। তবে এ বিষয়েও কমবেশি আছে। যতীন্দ্রমোহনে ও করুণানিধানে মাঝে মাঝে এ প্রেম দূরাগত জ্বলন্ত

উল্কার মত দেখা দিয়া থাকে, বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা এ গ্রহের অধিবাসী নয়, চলিয়া যাইবার মুখে একবার জ্বলিয়া গেল; কিন্তু কুমুদ মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কাব্যে—এ প্রেম নাই বলিলেই চলে। এখন প্রেমের এই রূপটির অভাব তাঁহারা ভক্তিতে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে তাঁহাদের জন্মপরিবেশ। নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা যেন ভক্তির সহজ অধিকার লইয়াই সংসারে প্রবেশ করেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও বৈষ্ণব কবি-গণের ভাবোন্মাদের ঐতিহ্য নদীয়া জেলা বর্ধমান জেলার এইসব কবিগণকে এমন সহজে, এমন অনায়াসে অনুপ্রাণিত করিয়াছে যাহা অপর স্থানের অধিবাসীর পক্ষে বিস্তর সাধনার ফল। এখানে সহায়ক পল্লী-পরিবেশ। আমাদের পল্লীর শান্ত, সংকীর্ণ, সামাজিক ও পারিবারিক বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের স্থান কোথায়? সেখানে স্বাভাবিক স্থান দাম্পত্যপ্রেমের—আর ভক্তির; এ দুয়ের মধ্যে একটি পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। যে-সব সামান্য বা সাধারণ উপাদানে এইসব কবিদের কাব্য গঠিত তাহার আলোচনা করিলাম, এবারে অন্য একটি প্রসঙ্গে যাওয়া যাইতে পারে।

৫

আগে এক বার বলিয়াছি যে, ইঁহাদের বর্তমান কবিখ্যাতির মূলে আছে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে স্থানলাভ। এবারে বলিতে যাইতেছি যে, ঐ সৌভাগ্যই (সত্যই সৌভাগ্য কি?) তাঁহাদের কাব্যের রসিক সমাজে প্রবেশের অন্তরায়। যে-সব কবিতার সঙ্গে প্রথম

ও প্রধান পরিচয় 'পাঠ্যপুস্তকে'র মধ্যস্থতায় তাহাদের প্রতি বয়স্ক পাঠকের মনে কেমন যেন একটা অনাদর ও অনাস্থার ভাব দেখা দেয়। ইহার প্রকৃত কারণ কি জানি না, অবচেতন মনের কোন্ রহস্য ইহার মূলে নিহিত বিশেষজ্ঞগণ বিচার করুন। কিন্তু মোটের উপরে কথাটা যে সত্য তাহা বোধ করি অনেকেই স্বীকার করিবেন। কাব্য প্রয়োজনের অতীত সম্পদ, এইরূপ একটি ধারণা মানুষের মনে থাকায় নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহৃত অভিধান—ব্যাকরণ—রচনা-শিক্ষার সহচর কবিতাসমূহেব উপরে মানুষের মনে কেমন যেন অশ্রদ্ধা জমিয়া যায়। ফলে স্কুল ছাড়িবার পরেও স্কুলের ভীতি ও স্মৃতি ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া "স্কুলপাঠ্য" কবিদের প্রতি পাঠকের মন প্রতিকূল করিয়া রাখে। কিন্তু একবার এই "Text Book Complex" বা পাঠ্যপুস্তকজাত বিভীষিকা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহাদের স্থায়ী সম্পদের অভাব নাই।

"যোগ্যতমের উদ্বর্তন" তত্ত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্র সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তর্ক উঠিবে যোগ্যতমের সংজ্ঞায়। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সাহিত্য যেমন গতানুগতিককে সহ্য করে না, তেমনি খাপছাড়া ও অদ্ভুতকেও বহন করে না। খাপছাড়া ও অদ্ভুত কিছুদিনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও চিরদিনের পাট্টা তাহাদের নাই। সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যটিকে যেমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এমন আর কিছুকে নয়।

এখন গতানুগতিক ও অদ্ভুতের মাঝখানে স্থান খুব প্রশস্ত। সেই স্থানে যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের মার নাই। পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ কবিদের স্থানও যেখানে, আবার minor poet-গণের স্থানও সেখানে; মহাকবি ও minor poet এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে আশ্রিত, অনেক সময়েই গায়ে গায়ে বিরাজ করে; কেবল অকবি ও কুকবিগণের সেখানে স্থান হয় না। আলোচ্য কবি চতুষ্টয় অকবিও নন, কুকবিও নন, minor poet—আর সেইজন্যই স্মৃতিযোগ্য কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান। সমসাময়িক বহুখ্যাত ও বিচিত্রকীর্তি অনেক কবি ও কবিতা যখন খাপছাড়া ও অদ্ভুত বলিয়াই তলাইয়া যাইবে, তখনও ইঁহাদের যে সরল, প্রাঞ্জল, বাঙালীর পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দে সমুজ্জ্বল কবিতাগুলি টিকিয়া থাকিবে তাহার সংখ্যা বড় অল্প নয়।

—শেষ—